শিক্ষা এবং শিক্ষক

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

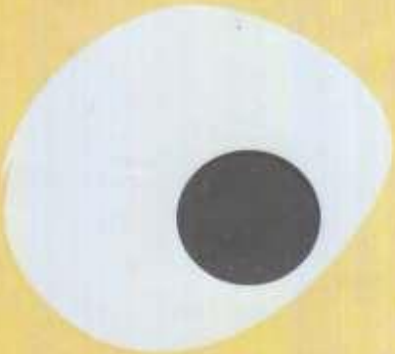

মাছুম বিল্লাহ

শিক্ষা এবং শিক্ষক

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

www.pathagar.com

শিক্ষা এবং শিক্ষক

প্রাসঙ্গিক ভাবনা

মাছুম বিল্লাহ

মূর্ধন্য

www.pathagar.com

চতুর্থ মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৫
তৃতীয় মুদ্রণ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৪
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুলাই ২০১৩
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে গ্রন্থমেলা ২০১৩

© লেখক

প্রকাশক
সঞ্জয় মজুমদার
মূর্ধন্য
(মূর্ধন্য : জ্ঞান, মস্তকজাত, শ্রেষ্ঠ)
৪১ কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স (বেইজমেন্ট)
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
০১১ ৯১১ ৯১১ ৪৩

মুদ্রণ
রেডিয়েন্ট প্রিন্টিং, ২৭ নীলক্ষেত, বাবুপুরা, ঢাকা-১২০৫

বর্ণবিন্যাস ও পৃষ্ঠাসজ্জা
মূর্ধন্য গ্রাফিক্স

প্রচ্ছদ
মোস্তাফিজ কারিগর

মূল্য
দুই শ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Siksha Ebong Sikshok (Teaching and Teacher) by : Masum Billah

Published February 2013 by Sanjoy Majumdar, Murdhonno, 41 Concord Emporium Shopping Complex (Basement), 253/254 Elephant Road, Dhaka-1205, Bangladesh. Cell : +8801191191143, e-mail : info@murdhonno.com, Web : www.murdhonno.com. Cover Design : Mustafij Karigar

Price : Taka 250.00 US $ 10.00 only

ISBN 978-984-504-166-9

www.pathagar.com

আমার পরম শ্রদ্ধেয়

বাবা-মা

যাদের চরম ত্যাগ ও উৎসাহ

আমাকে প্রেরণা যুগিয়েছে জীবনের

কণ্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করতে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ভূমিকা

শিক্ষকতা জীবনে শিক্ষার্থীদের এবং সহকর্মীদের কাছ থেকে দেখা, দেশি-বিদেশি শিক্ষকদের সাথে আলাপ-পরিচয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিক্ষা নিয়ে চিন্তাভাবনা, পড়াশুনা, জানার আগ্রহ, ক্যাডেট কলেজ জীবনের কিছু স্মৃতি, ক্যাডেট কলেজে ভর্তি নিয়ে অনেক অভিভাবক অনেক কিছু জানতে চান, তার উত্তর ইত্যাদি বিষয়ের সমাহার এই বইটিতে। ইংরেজি আমরা একটি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ি এবং পড়াই অথচ আমাদের শিক্ষার্থীদের ইংরেজি ভাষার দক্ষতা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে কাঙ্ক্ষিত পর্যায় পর্যন্ত পৌছায় না। তার কিছু কারণও আছে। সমস্যা আছে আমাদের ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি নিয়ে। নিজে ইংরেজি পড়াতে গিয়ে, শিক্ষক প্রশিক্ষণ কো-অর্ডিনেট করতে গিয়ে অর্জিত হয়েছে কিছু ধারণা ও অভিজ্ঞতা, যেগুলো তুলে ধরা হয়েছে এ বইয়ে। নিজের চিন্তাভাবনা-সম্বলিত লেখাগুলো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, কিন্তু চোখে হয়তো পড়েনি অনেক শিক্ষক, শিক্ষার্থীর। অনেক শিক্ষক জিজ্ঞেস করতেন যেসব বিষয় আমরা প্রশিক্ষণে দিয়ে থাকি, সেগুলোর এবং ইংরেজি পড়ানোর সহজ পদ্ধতি আমার কোনো বইয়ে লেখা আছে কিনা ইত্যাদি বিষয়গুলোও উদ্বুদ্ধ করেছে বইটি প্রকাশে। আমার বন্ধু একনিষ্ঠ শিক্ষক, রবীন্দ্রগবেষক সুব্রত কুমার দাস অনেকবারই বলেছেন আমার বাংলা লেখাগুলো নিয়ে একটি বই প্রকাশ করতে। এ ছাড়াও আমার ক্যাডেট কলেজের সহকর্মী ড. জয়নুদ্দীনও বারবার বলেছেন লেখাগুলো নিয়ে বই প্রকাশ করতে। আশা করি শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই বইটি পড়ে উপকৃত হবেন।

মাছুম বিল্লাহ

www.pathagar.com

সূচি

ইংরেজি গ্রামার নিয়ে কিছু কথা	১১
গ্রামার ট্রানস্লেশন এবং কমিউনিকেটিভ ইংলিশ–দুটো কি বিপরীতধর্মী পদ্ধতি? কোনটি বেশি কার্যকরী?	১৬
ইংরেজি পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা	২২
ভাষার চারটি দক্ষতার অবস্থান	২৬
রিডিং স্কিল বা পড়ার দক্ষতা কেন এবং কীভাবে বাড়াবেন	২৯
লেখার দক্ষতার গুরুত্ব এবং কীভাবে বাড়াবেন এই দক্ষতা	৩২
মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বলার চর্চা	৩৫
কীভাবে শিখবেন স্পোকেন ইংরেজি	৩৮
গল্পের মাধ্যমে ইংরেজি ক্লাস	৪১
সাধারণ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে কীভাবে ইংরেজি পড়াবেন	৪৪
মাইমিংয়ের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা	৪৭
ইংরেজি / দ্বিতীয় ভাষা সচেতনভাবে না অবচেতনভাবে শিখব?	৪৯
শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে আত্ম-অবলোকন বা সেলফ-মনিটরিং	৫১
শিক্ষকতা পেশা বোরিং না আনন্দময়?	৫৫
ফিডব্যাক	৫৯
শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা	৬১
কীভাবে বাড়াবেন আপনার Vocabulary এবং একজন শিক্ষক কীভাবে শেখাবেন	৬৪
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা	৬৯

www.pathagar.com

শিক্ষক সমিতি ৭৫
ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কিছু কথা ৭৮
ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক এবং তাদের পড়াশোনার চর্চা ৮৩
কোচিং সেন্টারগুলো কি ইংরেজি শেখাতে পারে? ৮৭
ইংরেজি মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের লেখাপড়া ৯১
প্রাথমিক শিক্ষায় হতাশা এবং আশা ৯৫
প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আসতে দিন ৯৯
জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও গণিত মেলার গুরুত্ব ১০৩
শিক্ষক প্রশিক্ষণ ১০৬
বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বিদেশে কেমন আছে ১০৯
শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ব্র্যাকের ভূমিকা ১১৩
কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট কোচিং কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ধ্বংস করছে? ১২১
বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত ১২৪
শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে কিছু কথা ১৩০
ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক বোর্ড গঠন সময়ের দাবি ১৩২
শিক্ষকদের সচেতনতা এবং শিক্ষাদান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ১৩৫
শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনা ১৩৮
সুবিধাবিহীন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে কে? ১৪০

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ইংরেজি গ্রামার নিয়ে কিছু কথা

কোনো ভাষার গ্রামার হলো ঐ ভাষার গঠনপ্রকৃতি, যার উপর ভিত্তি করে ঐ ভাষায় কোনো কিছু লেখা হয় এবং শুদ্ধ করে কথা বলার সময়ও ব্যাপারটি লক্ষ করা হয়। একটি ভাষা লেখার এবং বলার ক্ষেত্রে গ্রামারের নিয়ম মেনে চলতে হয়। আর একটি ভাষা শেখার উদ্দেশ্য হলো আমরা যাতে আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ওই ভাষা ব্যবহার করে আমাদের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাতে পারি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে আমরা কি প্রথম গ্রামার শিখব, না ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করা শিখব? আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, আমরা ইংরেজি গ্রামার দিয়ে ইংরেজি শেখা শুরু করি। ব্যাপারটি কতটা বাস্তবসম্মত এবং বৈজ্ঞানিক, তা আমরা খুব কমই ভেবে দেখি।

বাংলাও ইংরেজির মতো একটি ভাষা। শিশু যখন বাংলায় কথা বলা শুরু করে, তখন কি সে পদ, কারক, সমাস, প্রত্যয় ইত্যাদি খেয়াল রেখে কথা বলা শুরু করে, না সরাসরি ভাষা ব্যবহার করা শুরু করে? বাস্তব অবস্থা হলো শিশু এসব কিছুই জানে না, সে সরাসরি ভাষা ব্যবহার করা শুরু করে এবং এটিই স্বাভাবিক। তার চারপাশ থেকে শুনে শুনে সে ভাষা আয়ত্ত কলে ফেলে। সারা জীবনে সে ব্যাকরণ না জেনেও বাংলা ভাষা সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারে। তার অর্থ কি দাঁড়াচ্ছে? আমরা গ্রামার না শিখেও বাংলা ভাষা শিখতে পারি। একইভাবে একটি অশিক্ষিত ছেলে কিংবা মেয়েকে ইংরেজি ভাষাভাষী একটি দেশে পাঠিয়ে দিলে বছর দুয়েক পরে দেখা যাবে, সেই ছেলেটি কিংবা মেয়েটি অনর্গল ইংরেজি বলে যাচ্ছে। সে জানে না কোনটি কর্তা এবং কোনটি কর্ম, কিন্তু সে তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইংরেজি বলা শিখে ফেলেছে তার চারপাশের পরিবেশ থেকে। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে, গ্রামার ছাড়া ইংরেজি ভাষাও একজন মানুষ আয়ত্ত করতে এবং ব্যবহার করতে পারে। এখন আবার প্রশ্ন হচ্ছে, ইংরেজি শেখার জন্য

www.pathagar.com

আমরা কি আদৌ গ্রামার শিখব, না সরাসরি গল্প-প্রবন্ধ থেকে ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করব?

শিক্ষকতা জীবনে দেখেছি এবং এখনও দেখছি (কিছু ছেলে-মেয়ে ইংরেজি পড়তে আসে) অনেক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজি শিখতে এসে প্রথমে বলে, 'স্যার, আমি গ্রামারে খুব দুর্বল, আমাকে প্রথম গ্রামারটা শিখিয়ে দিন, বাকিগুলো পরে আস্তে আস্তে শিখব'। ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকগণও বলে থাকেন, 'ও গ্রামারে একটু দুর্বল, গ্রামারটা আগে বুঝিয়ে দিবেন যাতে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করতে পারে।' একটি ভাষা জানার জন্য সে ভাষা অভ্যাস করতে হয়। শুধু গ্রামারের কয়েকটি নিয়ম জানলেই যে ইংরেজি ভাষা শেখা যায় না, এ ব্যাপারটি যেমন বুঝতে চায় না ছাত্র-ছাত্রীরা, তেমন অভিভাবকরাও। শুধু গ্রামার শিখে যে বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করা যায় না, তার বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে আমাদের দেশের প্রায় সব গ্রাজুয়েট এবং মাস্টার্স ডিগ্রিধারীগণ বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়েছেন উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত, কিন্তু শতকরা কতজন ইংরেজি বলতে এবং লিখতে পারেন? কতজন ইংরেজি শুনে বুঝতে পারেন এবং ইংরেজিতে লেখা কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারেন? কোনো ভাষায় যদি কথা বলা না যায়, সে ভাষায় যদি নিজে কিছু লিখতে পারা না যায় এবং ঐ ভাষায় লেখা কোনো কিছু পড়ে না বুঝা যায়, তার অর্থ সে ভাষা আমাদের শেখা হয়নি। আমরা সবাই গ্রামারের প্রচুর নিয়ম-কানুন শিখে এসেছি এবং এখনও আমাদের টিচাররা প্রচুর গ্রামারের নিয়ম আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের মুখস্থ করাচ্ছেন এবং খুব ভালো ইংরেজির টিচার হিসেবে সমাজে আখ্যায়িত হচ্ছেন, কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীরা কি বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারছে? এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের সবার জানা। বাংলাদেশের একটি ছেলে কিংবা মেয়ে যদি ভারতীয় কিংবা শ্রীলংকার একটি ছেলে কিংবা মেয়ের সাথে চাকরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয় তা হলে দেখা যাবে বাংলাদেশি প্রার্থী অনেক পিছিয়ে আছে। আর এই পিছিয়ে থাকার প্রধান কারণটি হচ্ছে ইংরেজিতে পিছিয়ে থাকা।

হ্যাঁ, গ্রামার আমাদের শিখতে হবে। তবে প্রথমে শিখতে হবে তার প্রয়োগ, শুধু নিয়ম নয়। আমরা অনেকেই ইংরেজি গ্রামারের বিভিন্ন প্রকার এবং ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মকানুনও জানি কিন্তু বাস্তব জীবনে ইংরেজির প্রয়োগ জানি না। ইংরেজি ভাষার উপর যারা গবেষণা করেন, তারা গ্রামার নিয়ে যতটা মাথা ঘামান না, তার চেয়েও বেশি মাথা ঘামান আমাদের দেশের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীরা। এতদিন ধরে ইংরেজি জানার অর্থই ছিল বিভিন্ন ধরনের গ্রামারের প্রকারভেদ সম্পর্কে পুরোপুরি ধারণা থাকা। আমরা চিন্তা করে দেখিনি

www.pathagar.com

যে আমরা ইংরেজি কেন শিখছি। আর একটি ব্যাপার ছিল ইংরেজি লিখতে পারা। শুদ্ধভাবে কে ক'লাইন লিখতে পারে, ইংরেজি জানার এটাও একটি শর্ত ছিল। কেউ কখনও চিন্তা করিনি যে, ইংরেজিতে কথা বলতে পারা এবং ইংরেজিতে লেখা কোনো আর্টিকেল বা বই পড়ে তার মর্মোদ্ধার করাটা ইংরেজি জানার একটি উল্লেখযোগ্য শর্ত এবং বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ একটি ভাষা ফলপ্রসূভাবে জানার অর্থ হলো ঐ ভাষায় চারটি দক্ষতা থাকা। শ্রবণ করে ঐ ভাষা বুঝতে পারা, ঐ ভাষায় কথা বলতে পারা, লিখতে পারা এবং পড়ে বুঝতে পারা। আর চারটি বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করা শুধু গ্রামার শিখে সম্ভব নয়। বরং শুধু গ্রামারের ধারণা ভাষা ব্যবহারের দক্ষতাকে সীমিত করে ফেলে। ভাষা ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করার জন্য দরকার স্বতঃস্ফূর্ততা। আর এই স্বতঃস্ফূর্ততা অর্জন সম্ভব প্রচুর অভ্যাসের মাধ্যমে, গ্রামার জানার মধ্যে নয়।

একটি ভাষা জানার জন্য দরকার পরিবেশ। আমাদের ইংরেজি শেখার সে পরিবেশ নেই, থাকার কথাও নয়। কারণ আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। আমরা চারপাশে বাংলাই শুনব, এটাই স্বাভাবিক। আমরা যারা ইংরেজি শিখছি তারা ক্লাসের সময়টুকু যদি উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে অনেকটা অভ্যাস (প্রাকটিস) আমরা ক্লাসেই করতে পারি। ইংরেজি শেখার জন্য আমাদের অভ্যাস ক্লাসেই করতে হবে। এই অভ্যাস যে শিক্ষক যত বেশি করাতে পারবেন, তার শিক্ষার্থীরা তত বেশি উপকৃত হবেন।

ইংরেজি গ্রামার শিখতে হবে 'সিসুয়েশন' বা বাস্তব অবস্থা থেকে। বিচ্ছিন্নভাবে গ্রামার শিখলে তা ফলপ্রসূভাবে বাস্তব প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায় না, বরং ভাষাকে সীমিত করে ফেলে। অনেক ছাত্র-ছাত্রী কিছু কিছু শিক্ষকদের পরামর্শ অনুযায়ী গ্রামারের বিভিন্ন আইটেমের উপর বহু নিয়ম-কানুন মুখস্থ করে ফেলেছে। ঐসব ছাত্র-ছাত্রীদেরই যখন কোনো অনুশীলন করতে দেয়া হয়, যেখানে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার গ্রামার আইটেমের সমাহার, তখন তারা আর পারে না। কারণ, ঐ মুখস্থ করা বিষয়গুলো মনে করে করে এখানে আর ব্যবহার করতে পারে না। এটি কোনো গল্প নয়। আমার নিজের দেখা। ভাষা হচ্ছে ব্যাপক। প্রয়োজনে ভাষা তার দিক পরিবর্তন করে এবং অনেক কিছু গ্রহণ করে, নির্দিষ্ট কিছু গ্রামারের নিয়ম সবসময় তার ব্যাখ্যা দিতে পারে না। একটি ব্যাপার আমাদের ভালো করে বুঝতে হবে, সেটি হচ্ছে সাঁতার শেখা, সাইকেল চালানো, শাড়ি পরতে শেখা, টাই পরতে শেখা, রান্না শেখা এবং গাড়ি চালাতে শেখা যেমন শুধু নিয়ম মুখস্থ করে শেখা যায় না দরকার অভ্যাস, দরকার সুদীর্ঘ অনুশীলন, ঠিক তেমনি ইংরেজি শেখার জন্যও দরকার অনুশীলন, দরকার অভ্যাস। এ অভ্যাস করার সময় অনেক ভুল

www.pathagar.com

হবে, এভাবে ভুল করে করেই শিখতে হবে। এটাই নিয়ম। এটাই আধুনিক এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। সাইকেল চালানো এবং সাঁতার শেখা যেমন ভুল করে করে শিখতে হয়, একটি ভাষা আয়ত্ত করার পদ্ধতিও তাই। সব নিয়ম-কানুন আগে মুখস্থ করে পরে সাঁতার শিখব সেটি যেমন বাস্তবসম্মত নয়, তেমনি আগে গ্রামারের নিয়ম-কানুন শিখে এবং ভালোভাবে জেনে ইংরেজি অভ্যাস শুরু করব ব্যাপারটিও তেমন বিজ্ঞানভিত্তিক নয়।

আর একটি ব্যাপার বুঝতে হবে সেটি হচ্ছে, ইংরেজি হচ্ছে skills based subject, content based নয়। আর এই স্কিল বা দক্ষতা অর্জন করার জন্য দরকার অভ্যাস। কিন্তু এখনও দেখা যাচ্ছে, অধিকাংশ শিক্ষকই পরীক্ষার আগে ছাত্র-ছাত্রীদের সাজেশন তৈরি করে দেন। অর্থাৎ মুখস্থ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছেন। এসব শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের প্রচুর প্রশংসাও কুড়ান। কিন্তু আমরা কখনও চিন্তাও করি না এতে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীলতা নষ্ট হচ্ছে। অর্থাৎ ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ থেকে কিছুই সৃষ্টি করতে পারছে না। তাদের নিজস্ব চিন্তন ক্ষমতা হ্রাস করে দেয়া হচ্ছে। ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে জন্ম নিচ্ছে ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে ভুল ধারণা। তারা মনে করে, গ্রামারের কিছু নিয়ম জানা মানে ইংরেজি জানা। ইংরেজিতে কিছু লেখা মানে কোনো বই থেকে মুখস্থ করা। ভুল ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে সমাজে। আর এই সুযোগে প্রাচীন পদ্ধতির কিছু শিক্ষক কামিয়ে নিচ্ছেন অর্থ আর কুড়োচ্ছেন সুনাম। কিন্তু ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের অগ্রগতি কতটা হয়েছে, তা সমাজের সর্বত্র আমরা টের পাচ্ছি এবং বুঝতে পারছি আমাদের ইংরেজি শেখানোর পদ্ধতি কতটা ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ। ইংরেজি ভাষা শেখার বা শেখানোর পিছনে আমরা ব্যক্তিগত এবং জাতীয়ভাবে বেশ সময় ব্যয় করি। অথচ ইংরেজিতে কথা বলা, নিজ থেকে কিছু লেখা, ইংরেজি শুনে বুঝতে পারা আর ইংরেজিতে লেখা কোনো কিছু বুঝতে পারা ইত্যাদি বিষয়গুলোতে আমাদের ছাত্র-ছাত্রী এবং ইতিমধ্যে গ্রাজুয়েটরা কতটা দুর্বল তা আমরা প্রায় সবাই জানি এবং দেখি। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, তাহলে আমরা গত দশ কিংবা বারো বছর কী ইংরেজি শিখেছি? আসলে আমরা কিছু নিয়ম শিখেছি, ইংরেজি ভাষা শিখিনি। আর যে নিয়মগুলো শিখেছি সেগুলো খাতা কিংবা বইতেই সীমাবদ্ধ, বাস্তব জীবনে আমরা সেগুলো কাজে লাগাতে পারছি না।

মাতৃভাষা যেমন আমরা অবচেতন মনে ব্যবহার করি, ইংরেজিও তেমনি অবচেতন মনে ব্যবহার করার পদ্ধতিও শিখতে হবে এবং অভ্যাস করতে হবে। এ অভ্যাস না করে শুধু গ্রামার শেখার অভ্যাস করলে প্রকৃত অর্থে ইংরেজি শেখা যাবে না। বর্তমান ইংরেজি সিলেবাস অনেকটাই বিজ্ঞানভিত্তিক, কারণ ইংরেজি অভ্যাস

www.pathagar.com

করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এই সিলেবাসে এবং পাঠ্য বইয়ে। কিন্তু এই সিলেবাস বুঝে পড়ানোর জন্য দরকার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক-শিক্ষিকা, আর এখানেই আমাদের সমস্যা। প্রশিক্ষণ নিতে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা আসেন, তাদের অধিকাংশই বিশেষ করে চল্লিশোর্ধ যারা, তারা বর্তমান পদ্ধতির ঘোরবিরোধী। বহুদিন ধরে তারা যে পদ্ধতির সাথে পরিচিত, স্বভাবতই তারা নতুন কোনো পদ্ধতি মেনে নিতে চান না, যতদিন পর্যন্ত নতুন ধারার সুবিধাগুলো তাদের সামনে উন্মুক্ত করে দেয়া না হয়।

মাধ্যমিক পর্যায়ে নতুন সিলেবাসে পুনরায় গ্রামার সন্নিবেশ করা হয়েছে। ব্যাপারটি দেখে অধিকাংশ শিক্ষক-শিক্ষিকা বলছেন যে তাদের কথামতো গ্রামার ঠিকই আবার সিলেবাসে সংযুক্ত করা হয়েছে। তারা বলতে চাচ্ছেন যে ইংরেজি পড়ানো বা শেখানোর পদ্ধতি ট্রাডিশনালে ফিরে গেছে। ব্যাপারটি আসলে তা নয়। গ্রামার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা দিতে হবে বিষয়বস্তু থেকে। কোন ইংরেজি লেখা থেকে গ্রামার শেখাতে হবে। গ্রামারের বিভিন্ন বিষয় উক্ত লেখায় কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের সে বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে হবে এবং সেখান থেকেই তাদের শিখতে হবে তাদের নিজস্ব লেখায় কীভাবে সেগুলো ব্যবহার করবে। কারণ আমাদের বুঝতে হবে, শুধু গ্রামারের নিয়ম মুখস্থ করানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রামার ব্যবহার করানোর যোগ্যতা বা দক্ষতা অর্জন করানো।

www.pathagar.com

গ্রামার ট্রানস্লেশন এবং কমিউনিকেটিভ ইংলিশ–দুটো কি বিপরীতধর্মী পদ্ধতি? কোনটি বেশি কার্যকরী?

১৯৯৮ সালে আমাদের সিলেবাসে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ চালু করা হয় এই উদ্দেশ্যে যে গ্রামার ট্রানস্লেশন মেথড শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী ইংরেজি শেখাতে ব্যর্থ হচ্ছে, তাই তাদের কমিউনিকশেন স্কিল বাড়াতে হবে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মেকাবিলা করার নিমিত্তে। গ্রামার ট্রানস্লেশন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল নিষ্ক্রিয়। ক্লাস চলাকালীন তাদের নীরব ভূমিকা পালন করতে হতো এবং শুধু লেখার ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সক্রিয় থাকত। সেটাও সীমাবদ্ধ ছিল তাদের গ্রামার লেখা নিয়ে। এভাবে পাঠদানের অধিকাংশ সময়ই তারা নিষ্ক্রিয় থাকতো বলে কমিউনিকেশনের দক্ষতা তাদের বৃদ্ধি পেত না। শিক্ষক শুধু লেকচার দিতেন আর দু-একজন শিক্ষার্থী শুধু দুই একটি প্রশ্ন শিক্ষকদের করত, এছাড়া তেমন কোনো সক্রিয় অংশগ্রহণ তাদের ছিল না। ক্লাস যত বেশি নীরব থাকত, শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রী এবং অন্যান্যরা ভাবতেন যে, খুবই ভালো ক্লাস হচ্ছে। কারণ ক্লাসে কোনো হৈচৈ নেই, শব্দ নেই। এভাবে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে যে ব্যবধান সৃষ্টি হতো, তা তাদের সহপাঠীদের সাথে দক্ষতার ব্যবধান সৃষ্টি করত। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার তাগিদ দেয়, কারণ শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহার করতে হবে ক্লাসে, তবেই তারা ইংরেজি শিখবে। আর এটি করতে গিয়ে ক্লাসে গোলমাল হয়, তখন স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং কমিউনিকেটিভ ইংলিশ সম্পর্কে যেসব শিক্ষকদের ধারণা নেই তারা এটিকে গোলমেলে ক্লাস বলে থাকেন। ব্যাপারটি কি আসলেই তাই?

কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা শুধু রিডিং এবং লিসেনিংয়ের মতো রিসেপটিভ দক্ষতাই অর্জন করে না, তারা প্রোডাকটিভ স্কিল যেমন স্পিকিং

www.pathagar.com

ও রাইটিং স্কিলও অর্জন করে। কিন্তু আমাদের শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে হচ্ছে কি? তারা কি বাস্তব জীবনে কমিউনিকেশন দক্ষতা অর্জন করছে? কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ টিচিংয়ে শিক্ষকের কাজ হচ্ছে দ্বিতীয় ভাষায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যস্ত রাখা, যার মাধ্যমে তারা যোগাযোগের দক্ষতা অর্জন করবে ক্লাসরুমে এবং ক্লাসরুমের বাইরে। শিক্ষক তার শ্রেণিকক্ষে এমন সব কার্যাবলির অবতারণা করবেন যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তবজীবনে কমিউনিকেশনের সুযোগ পায়। একে অপরের সাথে যোগাযোগ করে কথা বলে কমিউনিকেশন করবে ইংরেজির চারটি স্কিল ব্যবহার করে।

ধরে নেয়া হয় যে কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ক্লাসে শিক্ষক সব সময় শিক্ষার্থীদের মাতিয়ে রাখবেন, ব্যস্ত রাখবেন, নিজে ইংরেজি বলবেন, শিক্ষার্থীদের বলাবেন। এই চিন্তা অনেকটাই বাস্তব থেকে দূরে। কারণ একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষককে প্রতিদিন ছয় থেকে সাতটি ক্লাস নিতে হয় এবং শুধু ইংরেজি ক্লাস নয়, অন্যান্য বিষয়েরও। স্বভাবতই তার মানসিকতা এমনিতেই একটু বিষানো থাকে। তার পক্ষে খুব মজা করে ইংরেজি ক্লাস পরিচালনা করা সম্ভব হয় না। দ্বিতীয়ত, অনেক ইংরেজি শিক্ষকের পক্ষেই ইংরেজি বলা বা শুদ্ধ করে লেখা সম্ভব হয় না। কারণ শুধু গ্রাজুয়েশন লেভেলে ১০০ বা ৩০০ নম্বরের ইংরেজি পড়লে ইংরেজির ভিত মজবুত না হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। ইংরেজিতে যারা অনার্স পড়েন, তারা সবাই মাধ্যমিক শিক্ষকতায় এখনও সেভাবে আসছেন না। ক্লাস খুব ফলপ্রসূ হবে, শিক্ষক ক্লাসকে আনন্দময় ও ফলপ্রসূ করবেন এই বিষয়গুলোর ওপর জোর দিয়ে 'ইংলিশ ফর টুডে' লেখা হয়েছে। কিন্তু এখানে এমন কোনো মজার গল্প নেই যে, শিক্ষার্থীরা মজা পাওয়ার আশায় গল্পটি পড়বে এবং ইংরেজি শিখবে, কিংবা কোনো টিচার ব্যস্ত থাকলেও একটু মজা দিতে পারবেন ক্লাসে। পুরোটাই টিচারকে বানাতে হবে যদি কোনো মজা দিতে হয়, যেটি সম্ভব হচ্ছে না। আর তাই শিক্ষার্থীদের অবস্থার উন্নতি তো হয়নি, বরং অনেক ক্ষেত্রে আরও পেছনে চলে গেছে। তারা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য তৈরি করছে, কোথায় কোন ক্রিয়া বা সাবজেক্ট/অবজেক্ট ব্যবহার করতে হবে তা তারা জানছে না এবং অনেক ক্ষেত্রে জানার প্রয়োজনও হচ্ছে না। নম্বর পেয়ে যাচ্ছে আর খুশি হচ্ছে। দু-একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাবে তাদের ইংরেজির বাস্তব অবস্থাটা কী? আমি ঢাকার শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিম্নলিখিত অবস্থা দেখছি ...

www.pathagar.com

তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ যেটি বারবার পরীক্ষায় আসে, তার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে এভাবে–

প্রশ্ন: Why was the National Memorial built at Savar? কেউ কেউ উত্তর লিখেছে National memorial build savar freedom fighters sacrifice. আবার কেউ কেউ লিখেছে National memorial built for sacrifice. ছোট হাত, বড় হাত, ক্রিয়ার ব্যবহার এগুলোর কোনো বালাই নেই। তারা বুঝতেই পারছে না কোথায় ভুল করছে। এটি হচ্ছে ঢাকার নামকরা দুটি স্কুলের শিক্ষার্থীদের অবস্থা। প্যাসেজটি তারা বারবার করেছে। নতুন একটি প্যাসেজ দিলে যে অবস্থা হবে তা সহজেই অনুমেয়। এবার ঢাকার অন্য একটি স্কুলের এক শিক্ষার্থী মোটামুটি ভালো বলে পরিচিত, স্পিকিং স্কিল দেখার জন্য নিচের প্রশ্ন দুটো করেছিলাম। প্রথমটি সে বলছে স্যার, এটার অর্থ কী? দ্বিতীয়টি সে বারবার বলার চেষ্টা করছে এবং একপর্যায়ে বাংলায় বলেছে। ইংরেজিতে যতটুকু বলেছে তা হচ্ছে I have only brother.

(i) How did you do in the first term examination?

(ii) How many brothers and sisters do you have?

ঢাকার বাইরে সিলেটের একটি স্কুলে নবম শ্রেণির ক্লাসে শিক্ষার্থীরে জিজ্ঞেস করেছি নিচের প্রশ্ন দুটি। ৩৮ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে একজনও উত্তর দিতে পারেনি অর্থাৎ তারা বুঝেনি। যখন তাদের শিক্ষক বাংলায় বলে দিলেন যে আমি কী প্রশ্ন করেছি, তখন একজন ছাত্র জবাব দিল 'থারটি এইট'। (i) How many students are there in your class? (ii) How do you like English?

ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্যাসেজ পড়তে পারে না তবে দ্রুত উত্তর দিতে পারে। উত্তরগুলো সত্য-মিথ্যা। কিছু লিখতে দিলে তারা লিখতে চায় না। কমিউনিকেশন তারা মুখে করতে পারছে না, লিখে করতে পারছে না। বইয়ে দেয়া প্যাসেজ তারা বুঝতে পারছে এবং ট্রু-ফলস ও মাল্টিপেল চয়েস প্রশ্ন তারা মোটামুটি পারছে। অবশ্য বুঝা যেত অন্য কোনো সূত্র থেকে যদি একটি প্যাসেজ দেয়া হতো। প্যাসেজগুলোর উত্তর বাজারের নোট ও গাইডে সব করে দেয়া আছে, শিক্ষার্থীরা ওগুলো বারবার করছে আর তাই মোটামুটি পেরে যাচ্ছে। একই প্যাসেজ তারা দিনের পর দিন করছে তাই পারছে। গ্রামার ট্রানস্লেশন মেথডে মাঝারি ধরনের শিক্ষার্থীরা একেবারেই কোনো কমিউকেশন করত না, শুধু লেখার মধ্যেই সীমাবদ্ধ

www.pathagar.com

ছিল এবং সে লেখা শুধু নোট থেকে নেয়া। কমিউনিকেটিভ ইংলিশে তাদের লেখার দক্ষতা একেবারেই বাড়ছে না। লেখার অংশটি এখনও গ্রামার ট্রানস্লেশন বা ট্রাডিশনাল মেথডেই রয়ে গেছে। তবে এতটুকুই ফল হয়েছে, ছাত্ররা একটি রাইটিংএ অংশ নিয়ে নাড়াচাড়া করে কিছুটা বুঝতে পারছে। অন্য তিনটি স্কিলে তেমন কোনো পরিবর্তন এখনও আনা সম্ভব হয়নি।

কমিউনিকেটিভ ইংরেজির দুর্বল দিকগুলো কী কী?

(১) শিক্ষার্থীরা পূর্ণ ইংরেজি শিখছে না। তারা একটি কিংবা দুটি বাক্যের উত্তর লেখা শিখছে তাও নিজেরা করছে না। ফলে ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা অর্জন করতে পারছে না।

(২) অলস হয়ে পড়ছে শিক্ষার্থীরা। তারা বেশি পড়তে চাচ্ছে না। অল্প পড়েই যেহেতু ভালো পাসের ব্যবস্থা হচ্ছে, কেন তারা অতিরিক্ত পড়তে যাবে?

(৩) দক্ষ ও প্রশিক্ষিত শিক্ষক যেহেতু নেই, পুরো কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ক্লাস পরিচালনা করা হচ্ছে না কোথাও। শুধু ঢাকা বা অন্য কোনো বড় শহরের দু-একটি স্কুলে হচ্ছে। তাও সব টিচারের ক্লাসে হচ্ছে না।

(৪) ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে পূর্বে আলাদা প্যাসেজ দেয়া থাকত, সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা কিছু ভাষা নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারত, গত কয়েক বছর যাবৎ গ্রামার চালু করায় শিক্ষার্থীদের পাসের সুবিধে হয়েছে, ভাষার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ এতে আরও কুণ্ঠিত হয়েছে। বুঝে বা না-বুঝে আর্টিকেলের ঘরে 'এ' অথবা 'দ্যা' বসিয়ে দিচ্ছে, কিছু হচ্ছে, কিছু হচ্ছে না। তাতে পাস করা কিংবা ভালো গ্রেড পাওয়া তেমন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে না।

শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ইংরেজি বলছে না কেন?

(১) কালচারাল ব্যারিয়ারের কারণে ও লাজুক বলে।

(২) ক্লাসে ইংরেজি না বলেও কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

(৩) ক্লাসের বাইরে তাকে ইংরেজি বলতে হচ্ছে না, বা বলার সুযোগও নেই। অতএব ক্লাসে কেন বলবে?

(৪) ক্লাসে শিক্ষক ইংরেজি বলছেন না। শিক্ষক বললে শিক্ষার্থীরাও উৎসাহিত বোধ করত। কিন্তু গ্রামের কোনো স্কুলে ইংরেজি শিক্ষক

www.pathagar.com

এখনও ইংরেজি বলছে না অনন্য ব্যতিক্রম ছাড়া। ঢাকায় কোনো কোনো স্কুলে কিছু কিছু শিক্ষক ইংরেজি বলছেন কিন্তু শিক্ষার্থীদের দ্বারা বলাচ্ছেন না এখনও।

লেখার ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর শিক্ষার্থীদের কম্পোজিশন লিখতে হয়। এবার যেটি আসবে, আগামী বছর সেটি আর আসবে না। ছাত্র-ছাত্রীরা যে কোনো সূত্র থেকেই ঐ লেখা সংগ্রহ করে, মুখস্থ করে লিখতে পারে এবং করছেও তাই। নিজ থেকে লেখার কোনো চেষ্টা বা উৎসাহ কিংবা কোনো ধরনের উদ্দীপনা নেই বলে ছাত্র-ছাত্রীরা কখনও নিজ থেকে লেখার কথা চিন্তাই করে না। অথচ কমিউনিকেটিভ ইংরেজি চালু করার মুখ্য উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে এটি একটি। ঢাকার কিছু ভালো স্কুল আছে, টিচাররা কম্পোজিশন ক্লাসে লিখে দেন পরীক্ষার কয়েক দিন আগে। ছাত্র-ছাত্রীদের ওগুলোই খাতায় লিখতে হয়, বাইরে থেকে লিখলে শিক্ষকগণ নম্বর দেন না। এটি সাধারণত ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্রেণিতে ঘটে। ব্যক্তিগত ও বাস্তবজীবনে ইংরেজি ফলপ্রসূভাবে ব্যবহার করার জন্যই কমিউনিকেটিভ ইংরেজির প্রচলন হয়েছে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এখনও দেখা যাচ্ছে না। একটি গল্প পড়ে তার উত্তর দিতে হলে শিক্ষার্থীরা বিবৃতিমূলক বাক্যের ব্যবহার শিখতে পারে, প্রশ্ন যদি অতীতকালে করা হয়, উত্তর সেভাবে দিতে হবে। কিন্তু এই বিষয়গুলো তারা এখনও ঠিকমত পারছে না।

এখন যা করা দরকার:

দ্বিতীয় পত্রে আলাদা প্যাসেজ থাকা দরকার বিদেশি বই কিংবা সংবাদপত্রের আর্টিকেল থেকে। তাহলে শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার অনেকটাই বাড়বে, নতুন নতুন বাক্য গঠনের সাথে পরিচিতি লাভ করবে। কিছুটা মজাও পাবে যেহেতু প্যাসেজগুলো গল্প আকারে থাকবে।

এক্সক্লুসিভ গ্রামার থাকা উচিত ২০ নম্বরের। বাকি ৮০ নম্বর কম্প্রিহেনশন ও লেখার আইটেম থাকা দরকার। লেখার মাধ্যমেই গ্রামার শিখবে শিক্ষার্থীরা। তারা যত বেশি ল্যাংগুয়েজ পড়বে, তাদের ভোকাবিউলারি বা শব্দভাণ্ডার তত বেশি বাড়বে। আর শব্দভাণ্ডার বাড়লে কমিউনেকেশনের দক্ষতাও বাড়াতে পারবে। পুরো কমিউনিকেটিভ পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়ানোর শিক্ষক নেই, স্কুলের অবস্থা সেরকম নেই, পরীক্ষার পদ্ধতিও কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় অর্থাৎ মুখস্থবিদ্যা এখনও চলছে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় পত্রে ইংরেজি

www.pathagar.com

কম্প্রিহেনশন থাকা দরকার। কম্প্রিহেনশনগুলো ভালো ইংরেজি গল্প থেকে নিতে হবে।

বিশেষজ্ঞ সমন্বয়ে সরকার একটি বিশেষ কমিটি গঠন করে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে। পরিবর্তন আমাদের আনতেই হবে, সেটি যত তাড়াতড়ি সম্ভব ততই মঙ্গল। কমিউনিকেটিভ ল্যাংগুয়েজ টিচিংয়ের ভালো দিকগুলো ব্যবহার করার জন্য ইংরেজি শিক্ষকদের উৎসাহিত করা, তাদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনে গ্রামার ট্রানস্লেশন মেথডের ভালো দিকগুলোও সন্নিবেশ করে ইংরেজি পড়ানোর ব্যবস্থা করা এখন সময়ের দাবি।

www.pathagar.com

ইংরেজি পড়ানোর পদ্ধতি নিয়ে কিছু কথা

একটি জাতীয় দৈনিকে জনৈক শিক্ষক কর্তৃক লিখিত জেরান্ড ও পারটিসিপল নিয়ে একটি লেখা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। এখানে কয়েকটি পয়েন্ট উল্লেখ করার মতো।

ইংরেজি ও বাংলা ভাষার গঠন প্রণালি আলাদা বাংলা দিয়ে ইংরেজি শেখাতে গেলে তা আর সঠিক ইংরেজি শেখা হবে না, সেটা অনেকাংশেই বাংরেজি হয়। আমরা মূলত তাই করছি। যেমন আমাদের দেশে প্রচলিত গ্রামার বইগুলোতে লেখা আছে কান্টিনিউআস টেন্‌স বুঝতে হলে দেখবে এর শেষে 'তেছি-তেছ' আছে কি না। এভাবে ইংরেজি শিখলে আসল ইংরেজি শেখা হয় না, ফলে ভুলটাই জানা হয়ে যায়।

ভাষা ব্যবহারের চেয়ে নিয়মকানুন জানা, নিয়মকানুনের গভীরে প্রবেশ করা, গ্রামারের চুলচেরা বিশ্লেষণ, বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগ এবং ব্যতিক্রমধর্মী নিয়মকানুন জানা বা ছাত্র-ছাত্রীদের জানানো নিয়েই শিক্ষকগণ বেশি ব্যস্ত থাকেন। বাস্তব জীবনে ভাষা ব্যবহারের দিকে তাদের দৃষ্টি কম কিংবা বিষয়টি একেবারেই গুরুত্ব পায় না, যার ফলে বাধ্যতামূলকভাবে ইংরেজি পড়ে পাবলিক পরীক্ষায় পাস করার পরেও আমাদের শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করতে পারে না। আমাদের দেশে ইংরেজি শেখার পদ্ধতি এসব নিয়মকানুনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কে কত বড় শিক্ষক এবং কে কতটা জানেন, সবই বিচার করা হয় এসব ব্যাপার দিয়ে।

ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী জানল যে sleeping যখন subject-এর মতো বাক্যের প্রথমে বসে অর্থাৎ noun-এর মতো কাজ করে, তখন তার নাম Gerund. আমাদের শিক্ষার্থী যারা গ্রাজুয়েট হয়েছেন, তারা এই ব্যাপারটি সবাই জানেন এবং তাদের শিক্ষাজীবনে ব্যাপারটির সাথে বহুবার পরিচিত হয়েছেন কিন্তু

www.pathagar.com

বাস্তবজীবনে ইংরেজি ব্যবহার করতে গিয়ে তারা সমস্যায় পড়ছেন। বাস্তবজীবনে ইংরেজি ভাষা কীভাবে কত সহজ উপায়ে আমরা ব্যবহার করতে পারি তা নিয়ে খুব কম কথাবার্তাই হচ্ছে। বরং নিয়মকানুন কত জটিল উপায়ে উপস্থাপন করা যায় ততই সাফল্য মনে করেন আমাদের অধিকাংশ শিক্ষক। এটি ইংরেজি শেখানোর ক্ষেত্রে একটি প্রধান সমস্যা। কেন আমরা বিশ্বায়নের যুগে এই ভাষা শিখছি এবং শেখাচ্ছি তা মনে হচ্ছে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় আর সেজন্যই আমরা ভাষা ব্যবহার করার চেয়ে ভাষার নিয়মকানুন জানানোর জন্যই বেশি ব্যস্ত। অভ্যন্তরীণ ও জাতীয় পরীক্ষায় একই ঘটনা ঘটছে অথচ ব্যাপারটি আমরা কেউই খেয়াল করছি না।

ইংরেজির গ্রামারের বিভিন্ন নাম, বিভাগ, কোথায় কখন এবং কেন বসে ইত্যাদি সব ছাত্রছাত্রীই সারা জীবন পড়ে কিন্তু তাতে কাজ কতটা হয়েছে বা হচ্ছে তার প্রমাণ আমাদের সামনে বর্তমান। বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে চরম দৈন্যতা প্রকাশ করে আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা। গ্রাজুয়েটগণ বাস্তবজীবনে ইংরেজি ব্যবহার করার জন্য আবার ভর্তি হন বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে যাতে তারা স্পোকেন ও রিটেন ইংরেজি শিখতে পারে। যেকোনো ভাষার ক্ষেত্রেই স্পোকেন কমিউনিকেশন ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমাদের অধিকাংশ যোগাযোগই হয় মৌখিকভাবে। আমরা প্রতিদিন যত যোগাযোগ অর্থাৎ কমিউনিকেট করি, তার অধিকাংশই মৌখিক। মৌখিকভাবে আমরা ৩৫ শতাংশের বেশি যোগাযোগ করে থাকি। ইংরেজি আমরা শিখি এবং শেখাই কিন্তু এই ব্যাপারটি কখনোই গুরুত্ব পায়নি বিধায় ছাত্র-ছাত্রীরা স্পোকেন ইংরেজিতে চরম দৈন্যতা প্রকাশ করে।

আসলে শিক্ষার্থীদের জানা দরকার ছিল verb-এর সাথে ing যোগ করে কীভাবে নিজেরা বাক্য তৈরি করবে এবং এগুলো ব্যবহার করে আরও বহু বাক্য তৈরি করা। শিক্ষক এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ হলো এ ব্যাপারটি নিশ্চত করা। কিন্তু কোনো পক্ষই এই ব্যাপারটিতে উৎসাহ প্রদান না করে শুধু জটিল নিয়মকানুন এবং এগুলোর ব্যাখ্যা করে বই-পুস্তক ভর্তি করে ফেলেছেন। আর এর ফলে শিক্ষার্থীরা ভাষা ব্যবহার করার কৌশল এবং দক্ষতা অর্জন করতে পারছে না। ভাষা ব্যবহার করার সুযোগ সীমিত করে দিচ্ছে জটিল গ্রামার জানার ও শেখার এই পদ্ধতি।

শিক্ষার্থীদের প্রচুর অনুশীলন করতে হবে প্রতিটি গ্রামার পয়েন্টের উপর, যাতে তারা grammar-এর ব্যবহার সঠিকভাবে করতে পারে নিয়মকানুন মুখস্থ করার ওপর কম গুরুত্ব দিয়ে। পরবর্তীকালে যখন ভাষার উপর উচ্চশিক্ষা নিবে কিংবা

www.pathagar.com

ভাষা নিয়ে গবেষণা করবে, তখন এসব বিষয় বিস্তারিত জানবে এবং গ্রামারের গভীরে প্রবেশ করবে। গ্রামারের প্রতিটি বিষয় প্রসঙ্গ থেকে শিখতে হবে, তাহলে সেটা হবে বাস্তবমুখী শিক্ষা। আমাদের ইংরেজি শিক্ষকগণ এবং বাজারে প্রচলিত বই-পুস্তক এই ব্যাপারটিকে মোটেই গুরুত্ব দিচ্ছে না। ফলে সঠিকভাবে ইংরেজি শেখা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। ইংরেজি শেখানোর জন্য দরকার সঠিকভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, যাদের অভাব আমাদের দেশে প্রকট।

আসলে ছাত্র-ছাত্রীদের আমরা কেন গ্রামার শেখাই আর আমরাই বা কেন শিখি, প্রশিক্ষণে আমি শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করি। সবাই জবার দেন, ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে শুদ্ধভাবে ইংরেজি লিখতে ও বলতে পারে। উত্তরে আমি বলি, আমরা তো গ্রামার পড়ানো শুরু করি সেই ছোট বয়স থেকেই। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে তো বটেই, তারপরেও ক'জন ছাত্র-ছাত্রী শুদ্ধভাবে ইংরেজি লিখতে বা বলতে পারে? আমাদের শিক্ষক সমাজের মধ্যেই বা আমরা ক'জন পারি? কিন্তু তারা সবাই গ্রামারের বিভিন্ন ধরনের নিয়মকানুনের সাথে পরিচিত, এসব জটিল দিকগুলোও জানেন কিন্তু স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা ব্যবহার করতে জানেন না। তাহলে আমাদের শুধু নিয়ম জানা এবং জানানোর ওপর এত গুরুত্ব দিয়ে কি লাভ হচ্ছে?

শুধু ব্যাকরণ শেখানো নিয়ে ব্যস্ত থাকা কতটা অবাস্তব আমরা কি কখনও তা ভেবে দেখেছি? যেমন – Rice is eaten by me. এ ধরনের ইংরেজি কি আমরা কখনও ব্যবহার করি? অথচ Active-Passive নিয়ে ইংরেজি শিক্ষকদের মধ্যে কে কতটা জানে তা দেখানোর প্রতিযোগিতা দেখা যায়। অস্বাভাবিক কিছু নিয়ম-কানুন সংযোজন করা হয় এবং জাতীয় পরীক্ষায়ও এসব প্রশ্ন দিয়ে মেধা যাচাই করা হয়, আসলে এসব পরীক্ষা দিয়ে কখনও ইংরেজির দক্ষতা যাচাই করা যায় না। যেমনঃ Honey is sweet when it is tasted. Passive করা যায় না জোর করে Passive -করার চেষ্টা, ইংরেজিতে কতটা দক্ষতা অর্জন করেছে তা কখনোই ভেবে দেখা হয় না।

Active Passive পড়ানো শুরু হয় প্রাইমারি স্কুল থেকে এবং চলতে থাকে ডিগ্রি পর্যন্ত কিন্তু বাস্তবে তারা এই জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে না, যখন বাস্তব জীবনে ইংরেজি ব্যবহার করতে হয়। ইংরেজিতে কিছু কিছু বাক্য আছে আসলেই Passive তা তারা বুঝতে পারে না। Passive-কখন হয়, সাধারণত কাজটি যখন গুরুত্বপূর্ণ, কে করেছে সেটি গুরুত্বপূর্ণ নয় কিন্তু শিক্ষার্থীরা এসব ক্ষেত্রে খুবই দুর্বল অর্থাৎ কোনটি subject ও কোনটি object–তা ছাত্র-ছাত্রীরা সঠিকভাবে নির্ণয় করতে পারে না। Active Passive পরিবর্তন করতে দিলেও তারা তা

www.pathagar.com

সঠিকভাবে করতে পারে না অর্থাৎ প্রাসঙ্গিকতা রক্ষা করতে পারে না। কারণ তারা বিষয়বস্তু থেকে এটা শেখেনি।

Narration (উক্তি) পড়ানোর ক্ষেত্রেও একই কথা। যে উদ্দেশ্যে উক্তি পড়ানো হয়, শিক্ষার্থীরা তা বাস্তবায়ন করতে পারে না বাস্তব জীবনে। উক্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়ার খেলা– প্রথম ক্রিয়া অতীতকালের হলে পরের ক্রিয়াও অতীত হবে, শুধু যেসব ব্যাপার পরিবর্তন করা যায় না কিংবা সবাই যে ব্যাপারটি জানে, শুধু সেসব ক্ষেত্রে ক্রিয়ার কালের পরিবর্তন হবে না। কিন্তু আমরা কী করি? গাদা গাদা নিয়ম যেমন Reporting Verb, Reported Speech, Inverted Comma ইত্যাদি বিষয় নিয়ে প্রচুর সময় ব্যয় করি আর ছাত্র-ছাত্রীরা বাস্তব জীবনে সঠিকভাবে উক্তির ব্যবহার জানেন না, তারা সবসময়ই ভুল করতে থাকে।

এতকিছুর পরও দেখা যায়, দিনের পর দিন শিক্ষাপদ্ধতি উন্নত হচ্ছে। ইংরেজি শেখার বা শেখানোর ধরন পাল্টে যাচ্ছে দুনিয়াব্যাপী অথচ আমরা বসে আছি সেই মান্ধাতার আমলে। এখনও ইংরেজি শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে সেই গুরুমারা ইংরেজি গ্রামার দিয়ে শিক্ষকদের ইংরেজি জ্ঞান পরীক্ষা করা হয়। ইংরেজি চারটি দক্ষতার পরীক্ষা নেওয়া হয় না এবং এই প্রক্রিয়ায় নিয়োগকৃত শিক্ষকরাও ইংরেজি সেভাবে পড়ান। শিক্ষকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা চলে কে কত কঠিন গ্রামার পড়াতে পারেন। অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরাও শিক্ষক যাচাইয়ের ক্ষেত্রে এই ব্যাপারটি দেখে থাকেন।

আর এই গ্রামারের জ্ঞান জাহির করার জন্য তাদের আপ্রাণ চেষ্টা। এ অবস্থা থেকে আমাদের পরিত্রাণ পেতে হবে আর পরিত্রানের প্রথম পন্থাই হলো উন্নতমানের শিক্ষক প্রশিক্ষণ। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষকদের ইংরেজি পড়ানোর ধরন পাল্টাতে হবে এবং শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে নিয়ে আসতে হবে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। তবেই আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বর্তমান বিশ্বের চাহিদামাফিক মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে পারব।

www.pathagar.com

ভাষার চারটি দক্ষতার অবস্থান

আমরা প্রতিদিন মনের ভাব আদান-প্রদানের জন্য এবং আমাদের প্রতিদিনকার যোগাযোগের জন্য সবচেয়ে বেশি পরিমাণে যে দক্ষতাটি এবং মাধ্যমটি ব্যবহার করি, সেটি হচ্ছে শ্রবণ। আমরা ৪০ শতাংশ যোগাযোগ শ্রবণের মাধ্যমে করি। দ্বিতীয় ম্যধ্যমটি হচ্ছে 'কথা বলা' বা স্পিকিং। আমরা প্রতিদিনকার যোগাযোগ ৩৫ শতাংশ করে থাকি স্পিকিংয়ের মাধ্যমে। পড়ার মাধ্যম আমরা ১৬ শতাংশ এবং লেখার মাধ্যমে ৯ শতাংশ যোগাযোগ আমরা এভাবেই করে থাকি। অতএব দেখা যায় ভাব আদান-প্রদান ও যোগাযোগের জন্য শ্রবণের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। তার পরেই আসে কথা বলা বা স্পিকিং অথচ আমাদের পুরো পরীক্ষাপদ্ধতি, অ্যাসেসমেন্ট সবকিছুর ক্ষেত্রে ৯ শতাংশ অর্থাৎ শুধু রাইটিং স্কিল নিয়ে ব্যস্ত। এই ৯ শতাংশ ও রিডিং স্কিল ১৬ শতাংশ অর্থাৎ ২৫ শতাংশের ওপর নির্ভর করে পাবলিক পরীক্ষায় গ্রেডিং, একজন শিক্ষার্থীর মেধা যাচাই সবকিছুই নির্ভর করছে ২৫ শতাংশ স্কিলের ওপর। আমরা শিক্ষার্থীদের বলে দিচ্ছি তুমি ইংরেজিতে এ প্লাস পেয়েছ, অর্থাৎ ইংরেজিতে তুমি মাস্টার। যেখানে লিসেনিং ৪০ শতাংশ, স্পিকিং ৩৫ শতাংশ অর্থাৎ ৭৫ শতাংশ আমরা পড়ানো বা মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে ধরছিই না, সেখানে কীভাবে আমরা শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করছি? বিষয়টি গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। শ্রবণ অর্থাৎ লিসেনিং আমরা কেন বেশি করি?

(১) আমরা সব কথা বলার সুযোগ পাই না
(২) সব সময় কথা বলি না বা লেখারও সুযোগ পাই না
(৩) আবার আমরা যখন পড়ি, তখন শ্রবণও করি, তাতে সাড়াও দেই
(৪) আমরা যখন লিখি, তখনও শ্রবণ করি
(৫) আমরা চুপচাপ থাকলেও শ্রবণ করি
(৬) অর্ধজাগ্রত থাকলেও আমরা শ্রবণ করি

www.pathagar.com

দ্বিতীয়টি হচ্ছে স্পিকিং। কোনো পরিচিত কিংবা অপরিচিত যে কারোর সাথেই হোক কথা বলে আমরা ভাব বিনিময় করি, পরিচিত হই, নিজকে জানাতে চাই, অন্যের সম্পর্কে জানতে চাই। ভালো কথা বলে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কিন্তু আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিতে বা ইংরেজি পড়ানোর ক্ষেত্রে এই দক্ষতা একবারেই অবহেলিত। শিক্ষক নিজেও অনুশীলন করেন না, শিক্ষার্থীদেরকেও করান না। এই দক্ষতা অনুশীলন করি না, কিংবা করাই না কারণ–

(১) পরীক্ষাপদ্ধতিতে লিসেনিং বা স্পিকিং নেই

(২) শিক্ষার্থীরা স্পিকিং বা লিসেনিংয়ের জন্য কোনো ধরনের চাপের মধ্যে থাকে না, আবার কোনো উৎসাহব্যঞ্জক অবস্থা বা পরিবেশও দেখে না যে ইংরেজিতে কথা বললে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কোনো শিক্ষক কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোনো প্রশাসক শিক্ষার্থীদের বলছে না, "তোমাদের এই ক্লাসে অবশ্যই ইংরেজিতে কথা বলতে হবে।" কিংবা কেউ বলছে না, "তোমাদের অজস্র ধন্যবাদ ইংরেজিতে কথা বলার জন্য।"

(৩) ইংরেজিতে কথা বলতে শিক্ষকও লজ্জা পান, শিক্ষার্থীরাও লজ্জা পায়। পুরো পদ্ধতি ক্লাসের নীরবতাকে মূল্যায়ন করে সফল ক্লাস হিসেবে। তাই সবাই ইংরেজি ক্লাসেও নীরব থাকে। স্কুল প্রশাসন নীরবতাকে চমৎকার ক্লাস বলে আখ্যায়িত করেন। তাই কিছু আধুনিক যুবক বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক যদিও ইংরেজিতে কথা বলা এবং শিক্ষার্থীদেরকে বলানোর চেষ্টা করেন, প্রশাসনিক ও সমালোচনার কারণে তারা আবার নীরবতা এবং বাংলাতেই চলে আসেন।

(৪) আর একটি কারণ হচ্ছে ইংরেজিতে ক্লাস পরিচালনা করার জন্য একজন শিক্ষকের যে লেভেলে স্পিকিং দক্ষতা থাকার কথা, অনেক শিক্ষকেরই তা নেই। কারণ, তিনিও তো এই পরিবেশ বা এই অবস্থার মধ্যেই ইংরেজি শিখেছেন।

এসব কারণে ৪০ শতাংশ লিসেনিং, ৩৫ শতাংশ স্পিকিং হওয়া সত্ত্বেও ১৬ শতাংশ রিডিং এবং ৯ শতাংশ রাইটিং অর্থাৎ ২৫ শতাংশ নিয়েই আমরা পুরো, পরীক্ষাপদ্ধতি, ব্যক্তি, সমাজ, প্রতিষ্ঠান এবং জাতীয় পর্যায় ব্যস্ত, মহাব্যস্ত। আমাদের সকল কর্মকাণ্ড, পরীক্ষা, পড়াশুনা, মান যাচাই, ভাষা জানার মানদণ্ড এবং ফলাফল সবকিছুই এই ২৫ শতাংশকে ঘিরে।

রাষ্ট্র কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের আগে আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে এ অবস্থার পরিবর্তন শুরু করতে পারি না?

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীদের লিসেনিং উন্নত করার জন্য সব সময়ই আমরা রেডিও টেলিভিশনে ইংরেজি সংবাদ দেখার, মুভি দেখার, বিবিসি, সিএনএন দেখা ও শোনার উপদেশ দিয়ে থাকি। শহর এলাকায় এবং কিছু কিছু গ্রাম এলাকায়ও ছাত্র-ছাত্রীরা বিনোদনের মাধ্যম হিসেবে এসব উপভোগ করে থাকে, তাই তাদের লিসেনিং এবং স্পিকিং কিছুটা উন্নতও। তাদের রিসেপটিভ ক্যাপাসিটিও উন্নত। কিন্তু পাঠ্যবইয়ের সাথে, পরীক্ষাপদ্ধতির সাথে, ফলাফলের সাথে এগুলো মিলাতে চায়। পরীক্ষাপদ্ধতিতে এগুলো নেই, দেখানোর কোনো ব্যবস্থাও নেই। তাহলে তারা কেন এটি অনুশীলন করবে। এখানেই শিক্ষক হিসেবে আপনার দায়িত্ব। আপনি একদিকে শিক্ষার্থীদের লিসেনিং এবং স্পিকিং বাড়াবেন, সাথে সাথে তাদের সিলেবাসও অনুশীলন করাবেন। কীভাবে এটি করাবেন?

পাঠ্যবই থেকে ভালো ভালো প্যাসেজগুলো আপনি সুন্দর করে ভালো উচ্চারণসহ পড়ে প্রস্তুতি নিবেন। ক্লাসে সেগুলো শিক্ষার্থীদর শোনাবেন। কয়েকটি ফোকাস প্রশ্ন বোর্ডে লিখবেন যাতে শ্রবণ করার সময় তারা ঐগুলো খোঁজে, আরও বেশি বুঝার চেষ্টা করেন। এতে ক্লাস আকর্ষণীয় হবে, একঘেয়েমি কাটবে, উন্নত হবে আপনার ডেলিভারি ক্ষমতা, শিক্ষার্থীদের শ্রবণশক্তি উন্নত হবে, ক্লাস অ্যাকটিভ হবে তার সাথে শেষ হবে সিলেবাস।

সিলেবাসের পড়াই শুধু লিখতে না দিয়ে প্রশ্ন ছুড়ে দিন, তাদেরকে উত্তর দিতে উদ্বুদ্ধ করুন, না পারলে ইংরেজিতে বলে দিন। আপনার বলার দক্ষতা বাড়বে, ছাত্র-ছাত্রীরাও মজা পাবে, তাদের মুখস্থ করার প্রবণতা কমবে, কারণ তারা ক্লাসে বারবার নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার ফলে পাঠ্যবইয়ের ব্যাপারগুলো তাদের আয়ত্তে থাকবে। মনে থাকবে, ফ্রেশ থাকবে।

পড়ার দক্ষতা উন্নত করার জন্য পাঠ্যবইয়ের সাথে সাথে ইংরেজিতে আকর্ষণীয় অনুচ্ছেদ বাছাই করে নিজে পড়ুন, ক্লাসে সেখান থেকে গ্রামারের বিভিন্ন আইটেম শেখান, দেখবেন তাদের আগ্রহ ক্লাসের প্রতি আরও বেড়ে যাবে।

লেখার ক্ষেত্রেও সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যবহার করুন। তাদের সম্মিলিত ধারণা একত্রে করুন, সেই ধারণাগুলোতে ভাষা দেওয়ার জন্য তাদের উৎসাহিত করুন।

www.pathagar.com

রিডিং স্কিল বা পড়ার দক্ষতা কেন এবং কীভাবে বাড়াবেন

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পড়া, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগীয় উন্নয়নের জন্য পড়ার ভূমিকা অনেক। শিক্ষার্থীরা যদি বিভিন্ন ধরনের পড়ার বিষয় বা ম্যাটেরিয়ালস না পড়ে তাহলে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দক্ষতা হারাবে। পড়ার মাধ্যমে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে। পড়া বিভিন্ন বিষয় যেমন গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ভূগোল সম্পর্কে জানার দ্বার উন্মোচন করে। এভাবে পড়ুয়ারা এসব বিষয়ে সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ছোট সময় থেকেই পড়ার অভ্যাস মানুষকে অনেক বেশি পজিটিভ বিষয় দান করে, তাই ছোট সময় থেকেই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে আর এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন অভিভাবক ও শিক্ষকগণ।

বইয়ের পাতায় ডুবে থাকা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অথচ সহজতম আনন্দের উপায়। বই আপনার কল্পনাকে এমনভাবে ব্যস্ত ও নিয়োজিত রাখে, যা কোনো সিনেমা কিংবা মুভিও পারে না। গল্পের বই হলে লেখকের কথার সাথে আপনার নিজের ইমেজকে জোড়ার চেষ্টা করেন। বিশেষ এক ধরনের অনুভূতির জন্ম হয় আপনার মধ্যে। আপনি নতুন পৃষ্ঠায় যাবেন। নতুন কিছু আবিষ্কার করবেন অর্থাৎ বই পড়া মানে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের সাথে পরিচিত হওয়া। আপনি যদি ভালো এবং মনোযোগী পড়ুয়া হন, তাহলে সেখান থেকে লেখার নতুন গাঁথুনি আবিষ্কার করবেন এবং আপনার নিজের লেখায় তা ব্যবহার করতে পারবেন। সেখান থেকে আপনি নতুন নতুন ধারণা খুঁজে পাবেন। সেগুলোর ব্যবহারও খুঁজে পাবেন। উপসংহারে বলা যায়, একজন ভালো পাঠক কোনো লেখার ও লেখকের উদ্দেশ্য আবিষ্কার করতে পারেন এবং নিজের লেখায় তা ব্যবহার করতে পারেন। অর্থাৎ একজন ভালো পাঠক একজন ভালো লেখক হতে পারেন। শিক্ষা গবেষকগণ আবিষ্কার করেছেন যে পড়া এবং শব্দভাণ্ডার বাড়ানোর মধ্যে একটি গভীর সম্পর্ক

www.pathagar.com

রয়েছে। যাদের শব্দভাণ্ডার বেশি, বুঝতে হবে তারা ভালো পাঠক। আপনি যদি আপনার শব্দভাণ্ডার বাড়াতে চান, আপনাকে ব্যাপকভাবে পড়তে হবে।

শ্রেণিকক্ষে একজন শিক্ষক জ্ঞানের উৎস, তার সাথে শিক্ষার্থীর বই পড়া এবং সেখানে থেকে আহরিত বিষয় যদি সমন্বয় করা হয় শ্রেণিকক্ষে, তাহলে জ্ঞান বিনিময়ের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। শুধু পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সবসময় ব্যস্ত থাকলে চলবে না কারণ তা শিক্ষার্থীদের সব সময় আনন্দ দিতে পারে না আর পরিপূর্ণ জ্ঞানও দান করতে পারে না।

কীভাবে বাড়াবেন আপনার পড়ার দক্ষতা?

পড়ার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য পড়ার কোন বিকল্প নেই। কী পড়বেন? আপনি যদি শিক্ষক হন তাহলে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক অনেক বই আপনাকে পড়তে হবে। অনেক অজানা শব্দ হয়তো পাবেন, বারবার পড়ুন, প্রসঙ্গ থেকে অর্থ অনেকটাই বুঝা যাবে। যেগুলো একেবারেই বুঝা যাবে না, সেগুলোর ব্যবহার অক্সফোর্ড বা চেম্বারস ডিকশনারি থেকে দেখুন। এসব ডিকশনারিতে সুন্দর করে শব্দের প্রয়োগ ও ব্যবহার দেখানো হয়েছে। আপনার এটিই দরকার। অনেকে বাংলা ডিকশনারি থেকে শুধু শব্দ মুখস্থ করেন, এই শব্দ মুখস্থ আপনার খুব একটা কাজে লাগে না যদি আপনি শব্দের প্রয়োগ না জানেন।

ক্লাসে পাঠদান করার সময় শিক্ষার্থীদের বারবার পড়তে দিন, তারা চাবে আপনি তাড়াতাড়ি বাংলা বলে দিন, তাহলে তারা সহজে বুঝবে। যেসব শিক্ষক সরাসরি বাংলা বলে দিচ্ছেন, স্বভাবতই তারা ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বেশি প্রিয়। প্রধান শিক্ষক, অন্যান্য শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবকসহ সবাই ঐসব শিক্ষকদের বাহবা দিয়ে থাকেন বলে থাকেন যে 'অমুক স্যার' সুন্দর করে ইংরেজি বুঝিয়ে দেন। মনে রাখতে হবে, ভাষা বুঝানোর চেয়ে বুঝতে পারা এবং বুঝাতে পারাটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং কার্যকরী। তারা সবার কাছে প্রিয় কারণ সবাই মনে করে ঐ শিক্ষক তাদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু সবাইকে বুঝতে হবে যে ভাষা শিক্ষার ক্লাস আলাদা। ভাষা শিখানোর ধরন অন্যান্য ক্লাসের চেয়ে আলাদা। এই বিষয়গুলো আমাদের সমাজে প্রচলিত নেই বিধায় সবাই মনে করে যেসব শিক্ষক ক্লাসে তাড়াতাড়ি বাংলা বলে দেন, তারাই আসল শিক্ষক। ব্যাপারটি আসলে তা নয়।

ইংরেজির কোন বিষয় শিক্ষার্থীকে বারবার পড়তে হবে, ভিতরে ঢুকতে হবে, কনটেক্সট থেকে শব্দের অর্থ বুঝার চেষ্টা করতে হবে। শিক্ষক যদি তাড়তাড়ি বাংলা বলে দেন তাহলে শিক্ষার্থীর রিজনিং ক্যাপাসিটি হ্রাস পায়, বিশ্লেষণমূলক

www.pathagar.com

ক্ষমতাও হ্রাস পায় বা সহজে বাড়তে পারে না। ইংরেজি শেখানোর সময় বাংলা বলে দেওয়াটা যদিও খুব সুখকর মনে হয়, এর মাধ্যমে আসলে শিক্ষার্থীদের স্লোপয়জনিং করা হয়, কারণ শিক্ষার্থীদের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ও কমপ্রিহেনসিভ ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। অথচ শিক্ষার কিংবা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীর ঐ ভাষা ব্যবহার করা যোগ্যতা অর্জন করানো।

ইংরেজি পড়ে ধীরে ধীরে বুঝতে পারাই হচ্ছে সঠিক ধরনের রিডিং। একটি সময় আসবে যখন তাড়াতাড়ি আপনি বুঝতে পারবেন, আপনার রিজনিং ও আন্ডারস্ট্যান্ডিং পাওয়ার তখন বেড়ে যাবে। আর বাংলা দিয়ে তাড়াতাড়ি শিখতে চাইলে সেই ব্যাপারটি ঘটবে না। আপনি শব্দের প্রয়োগ জানবেন এভাবে পড়লে, আর এভাবে জানলে তা দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারবেন এবং নিজে শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারবেন। সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলোকে কি আমরা সব সময়ই পুষব? বরং সবাইকে বুঝাতে হবে যে ভাষা শিক্ষার ক্লাস আলাদা, ভাষা শেখানো ধরন আলাদা।

বাংলাদেশের প্রথমদিকে কিংবা পাকিস্তান আমলে বাজারে নোটবই খুব একটা পাওয়া যেত না, এগুলোর ব্যাপক প্রচলন তখন ছিল না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের বোঝার ক্ষমতা ছিল প্রখর, তাদের শিক্ষা ছিল খাঁটি। তারা তৃতীয় শ্রেণি পেলেও অনেক ভালো ইংরেজি লিখতেন, বলতে পারতেন। তাদের বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা ছিল প্রশংসনীয়, বর্তমানে ইংরেজিতে অনার্স পড়ুয়া শিক্ষার্থীরা রামজি লাল, তিলকের নোট পড়ে সহজেই দ্বিতীয় শ্রেণি পেয়ে যান কিন্তু তাদের বিশ্লেষণধর্মী ক্ষমতা বা ইংরেজি ভাষায় খুব একটা দখল অনেকেরই নেই। আপনার পড়ার দক্ষতা বাড়াতে হলে মূল ইংরেজি বই বারবার পড়তে হবে। রামজি লাল, তিলক পড়ুন, তবে তা ব্যবহার করতে হবে শুধু সহায়ক বই হিসেবে। আসুন, আমরা আমাদের পড়ার দক্ষতা বাড়াই এবং শিক্ষার্থীদেরকেও উৎসাহিত করি এবং অভ্যাস করাই কীভাবে বাড়বে তাদের পড়ার দক্ষতা, কারণ এটি ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি দক্ষতা।

www.pathagar.com

লেখার দক্ষতার গুরুত্ব এবং কীভাবে বাড়াবেন এই দক্ষতা

বাস্তব জীবনে আমাদের অনেক কিছু লিখতে হয় অফিসিয়াল কারণে, কোনো ডকুমেন্ট রাখার নিমিত্তে এবং নিজেকে প্রকাশ করার জন্য। আমরা যারা পড়াশুনা করছি বা পড়াচ্ছি বা চাকরি করছি, তারা সবাই পরীক্ষা দিয়ে ডিগ্রি অর্জন করেছি, সার্টিফিকেট অর্জন করেছি, আর এসব পরীক্ষার প্রধান অংশই ছিল লিখিত। আমাদের লেখাই আমাদেরকে পরিচিত করিয়েছে পরীক্ষকদের কাছে, চাকরিদাতাদের কাছে, তাই নয় কি? একজন শিক্ষক ক্লাসের সব ছাত্র-ছাত্রীদের হয়তো চিনেন না, কিন্তু পরীক্ষার খাতা পরীক্ষণের সময় কোনো একটি ভালো খাতা পেলে উক্ত ছাত্র বা ছাত্রীকে চিনে রাখেন বা চিনে ফেলেন। এভাবে লেখা বা ভালো কিছু লেখার দক্ষতা আপনার একটি অমূল্য সম্পদ। আপনি যখন কোন একটি লেখা পড়েন, তখন দেখা যায় অধিকাংশ বিষয়ই অপনার জানা বা পরিচিত, আপনি হয়তো তখন মন্তব্যও করে ফেলেন, 'এতে নতুন কিছু নেই, এ বিষয়গুলো তো আমিও জানি' ইত্যাদি। কিন্তু ঐ সাধারণ বিষয়গুলোই সাজিয়ে লিখতে পারাটা অনেক বড় কাজ। আপনি হয়তো চিন্তা করছেন, ভাবছেন কিন্তু লিখছেন না। যিনি লিখেছেন তিনি কিছু একটা সৃষ্টি করেছেন এবং পাঠকের সামনে, মানুষের সামনে তার বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন। লেখার দক্ষতা বাড়ানোর উপযুক্ত সময় হচ্ছে ছাত্রজীবন, কারণ এ সময়ে বাধ্য হয়ে অনেক কিছু লিখতে হয়। শিক্ষকদের দায়িত্ব হচ্ছে শিক্ষার্থীদের লেখার দক্ষতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ যোগানো, সহায়তা করা, ক্লু দেওয়া, লেখা উন্নত করার পথ বাতলে দেওয়া। শিক্ষার্থীরা যাতে নিজ থেকে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় ভাষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে, সাথে সাথে তাদের ধারণার এবং চিন্তার ব্যাপকতার বিস্তার ঘটাতে পারে শিক্ষকদের সে বিষয়গুলোতে সব সময়ই সচেষ্ট থাকা প্রয়োজন।

লেখা একটি প্রাথমিক ভিত্তি, যার দ্বারা আপনার কাজ, শিখন এবং বুদ্ধিবৃত্তি বিচার করা হয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, চাকরিস্থলে এবং আপনি যেখানে বাস করছেন। লেখা

www.pathagar.com

বলে দিচ্ছে আপনি কী ধরনের ব্যক্তি অর্থাৎ আপনার চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি আপনার দর্শন প্রকাশ পাচ্ছে আপনার লেখার মধ্যে। লেখার দক্ষতা স্থায়ী এবং আপনার সাথে সাথেই থাকে। লেখা আপনার অবস্থান পাঠককে বলে দিচ্ছে। একজন পাঠক একটি জটিল বিষয় হয়তো ভালোভাবে বুঝতে পারছেন না, আপনার লেখা তা প্রকাশ করে দিচ্ছে, সহজ করে দিচ্ছে। তৈরি করছে আপনার এবং পাঠকদের মাঝে সেতুবন্ধন।

লেখা আপনার ধারণাগুলোকে পরিশুদ্ধ ও পরিশীলিত করছে। আপনি লিখিত আকারে যখন কোনো 'ফিডব্যাক' কাউকে দিচ্ছেন, সেটি তখন পরিশীলিত। লেখা আপনাকে বলে দিচ্ছে আপনার পাঠক কী চাচ্ছে অর্থাৎ আপনার চিন্তনক্ষমতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। এতে আপনার বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্লেক্সিবিলিটি এবং ম্যাচিউরিটি প্রকাশ পায়। লেখা আপনাকে উজ্জীবিত করে, আপনি মনে মনে যা ভাবছেন তারও বাইরে যেতে। দেখবেন আপনি একটি বিষয় লিখে ফেলেছেন, পড়ে দেখবেন আপনি যে চিন্তা করেছিলেন তার চেয়েও ভালো হয়েছে। নির্দিষ্ট জায়গায় এবং সময়ে কতটা সত্য এবং বাস্তবতা প্রকাশ করতে পেরেছেন তারও প্রকাশ এই লেখায়। সর্বোপরি বলা যায়, লেখার দক্ষতা আপনার চাকরি-বাকরি এবং রুজিরোজগারের জন্য দরকার, আপনার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থানের জন দরকার।

কীভাবে বাড়াতে হবে লেখার দক্ষতা। অনেক শিক্ষার্থীই মনে করে, আমাদের ভাষাজ্ঞান কম, অতএব আমরা লিখতে পারছি না। ভাষাজ্ঞান কম এটি একটি সত্য কথা কিন্তু সেই ভাষাজ্ঞান যতটা না বাধা হয়, তার চেয়ে কোনো কিছু লিখতে ধারণা বা চিন্তার ক্ষমতা না থাকা। যেমন একজন শিক্ষার্থীকে 'পরিবেশ বিপর্যয়' নিয়ে কিছু লিখতে বলা হলো, দেখা যাবে সে বই-পত্র খোঁজাখুঁজি শুরু করে দিয়েছে। বই খোঁজাখুঁজি করা খারাপ নয়, যদি অতিরিক্ত কিছু ধারণা সেখান থেকে নেয়ার থাকে, কিন্তু শিক্ষার্থীরা যা করে তা হচ্ছে ঐ বইয়ে যা লেখা আছে, তার পুরোটাই মুখস্থ করে লিখে ফেলে। এতে নিজের যে ধারণাগুলো ছিল, সেগুলোকে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়া হলো না, নিজের ভাষা ব্যবহার করার যে সুযোগ তৈরি হলো, সেটিও হতে না দেওয়া। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে শিক্ষকগণও শিক্ষার্থীদের নিজের লেখার কোনো গুরুত্ব দেন না বা মূল্যায়ন করেন না। নিজে লিখতে গেলে কিছুটা ভুলভ্রান্তি হতে পারে শিক্ষককে সেগুলো বুঝে সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিতে হবে। আমি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রচুর উৎসাহ দিতাম, যাতে নিজেরা কিছু লিখতে পারে, কেন লিখবে নিজে, কী উপকার হবে ইত্যাদি বুঝিয়ে দিতাম। তারপরেও কিছু কিছু শিক্ষার্থীদের উত্তর, "স্যার, এত কষ্ট করে লাভ কী? বইয়ে তো ভালো করে লেখা

www.pathagar.com

আছে। হুবহু ঐটি লিখে দিলেই তো অনেক নম্বর পাওয়া যায়, ভুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে কম।" অন্য এক শিক্ষার্থীর উত্তর, "স্যার, নিজে লিখতে গেলে তো অনেক ভুল হয়, নিজে লিখে দেখেছি স্যাররা নম্বর দেন না বরং ভুল হওয়ার জন্য প্রচুর বকাঝকা করেন।" এখানে একটি বড় সমস্যা রয়ে গেছে। শিক্ষকগণ নিজেরা সৃজনশীলতার চর্চা করেন না, শিক্ষার্থীদের চর্চা করতে দেন না। করলে নিরুৎসাহিত করেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। এই অভ্যাস আমাদের পরিহার করতে হবে।

জীবনে ক্যারিয়ার পাথ তৈরি করতে এবং লক্ষ্যে পৌঁছুতে লেখার দক্ষতা অর্জন করা দরকার। মনে রাখতে হবে, লেখা ভাব আদান-প্রদানের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। আমাদের কথা আমরা দূরবর্তী মানুষের জন্য, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য লেখার মাধ্যমে রেখে যাই বা পৌঁছাতে পারি। আমরা জীবনে সবাই বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হই। পরীক্ষার বিরাট অংশটাই থাকে লেখা। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আমাদের লেখার দক্ষতা প্রদর্শন করতে হয়। আর তার মাধ্যমে জীবনের পরবর্তী অংশের সাফল্য ও ব্যর্থতাও নির্ণিত হয়। লেখার দক্ষতা না থাকলে ভুল তথ্য সংযোজিত হয় কর্তৃপক্ষের নিকট উল্টো প্রমাণিত হয় আমাদের যোগ্যতা। লেখার মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে আপনি কে? কী বলতে চান? আপনি উপস্থিত নেই কিন্তু আপনার লেখা অপনাকে সবার কাছে পরিচিত করাবে। অতএব আসুন, আমরা লেখার অভ্যাস গড়ে তুলি।

লেখার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য আপনাকে প্রচুর পড়তে হবে। পড়তে হবে নতুন নতুন ধারণা নেওয়ার জন্য কোনো বিষয়ে, এতে ঐ বিষয়টি সম্পর্কে আপনার চিন্তার প্রসারতাও বাড়বে। সাথে সাথে আপনার ভাষাগত দুর্বলতাও কেটে যাবে। আপনি একটি লাইন বা দুটি তথ্য উপস্থাপন করতে চান আপনার লেখায় কিন্তু কীভাবে লিখবেন বুঝতে পারছেন না, বিভিন্ন সূত্রের পড়া আপনাকে সাহায্য করবে। (সূত্রগুলো হচ্ছে বাংলা ও ইংরেজি সংবাদপত্র, গল্পের বই, ক্লাস, শিক্ষকদের সঙ্গে আলাপচারিতা, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে আলাপচারিতা, টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সভা-সমাবেশে অংশগ্রহণ, ইন্টারনেট ইত্যাদি) আমাদের চারপাশের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা আমাদের লেখার উপকরণ সংগ্রহ করতে পারি।

www.pathagar.com

মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি বলার চর্চা

আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ইংরেজি বলার চর্চা কতটা হচ্ছে– এ প্রশ্নের উত্তর অনেকটাই বড় 'না' বোধক হবে। শিক্ষক যখন ইংরেজি পড়ান, তিনি কি তখন ইংরেজি বলেন? তিনি ইংরেজি বলেন না কারণ কেউ কেউ মনে করেন, ইংরেজি বললে শিক্ষার্থী তার কথা বুঝবে না। আসলে শিক্ষার্থীদের ইংরেজি বলা উচিত। কারণ কৈশোর বয়সের শিক্ষার্থীরা যতটুকু শুনবে ততটুকু মনে রাখতে পারে। তারা অনুকরণপ্রিয়। শিক্ষক যা করবেন, তারাও তাই করবে, শিক্ষক যা বলবেন, তারাও তা-ই বলবে। আমার মনে আছে, আমি প্রায়ই ক্লাসে বলতাম, You boy, so what, thanks a lot. ইত্যাদি। ছাত্র-ছাত্রীরা মজা করে বা ব্যঙ্গ করে, অনুকরণ করে হোক কিংবা বয়সের কারণেই হোক তারা ঐ শব্দগুলো বলত। অর্থাৎ শব্দগুলোর ব্যবহার তারা শিখেছে। এভাবে শিক্ষক যখন তাদের জিজ্ঞেস করবে What about your homework? তারা বাক্যটি শিখে ফেলবে এবং বাস্তবজীবনে ব্যবহার করতে শিখবে। তারা জেনেছে, কোনো অবস্থায় এই বাক্যটি ব্যবহার করতে হয়। মাতৃভাষা ব্যতীত অন্য কোনো দ্বিতীয় ভাষা শেখার এটি একটি উৎকৃষ্ট উপায়।

শিক্ষক ক্লাসে গিয়ে বলবেন Good morning, My dear students, how are you? এই শব্দগুলো একদিকে যেমন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর এবং শিখনবান্ধব করে, অন্যদিকে শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাসী, সাহসী করে তোলে এবং সর্বোপরি ইংরেজি ভাষা মূলত যে জন্য আমরা শিখি সেই উদ্দেশ্যগুলোও সফল করতে সহায়তা করে। আর ক্লাসে যখন এই ধরনের পরিবেশ বিরাজ করে যে ছাত্র-শিক্ষক এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে শিখন-শেখানোর কাজ করছেন, তখন শিক্ষার্থীদের সব সময়ই আকর্ষণ থাকবে ক্লাসের দিকে। তারা ঐ বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ থেকে নিজকে দূরে রাখতে চাইবে না অর্থাৎ ক্লাসে থাকার কিংবা আসার জন্য উদগ্রীব থাকবে। শিক্ষক বলবেন, Please open at page 19. Now let

www.pathagar.com

us start chain drill. Let us start a new lesson, shall we? tag question কোন অবস্থায় ব্যবহার করতে হয়, কোন বাক্যে কী ধরনের tag ব্যবহার করতে হয় তা শিক্ষার্থীরা ক্লাসে স্পোকেন ইংরেজির মাধ্যমেই শিখে ফেলবে, আলাদা বই থেকে কিংবা অবাস্তব অবস্থা থেকে মুখস্থ করতে হবে না। বাস্তব অবস্থায় যখন তারা শিখবে তার গুরুত্ব এবং তা ধরে রাখার ক্ষমতা থাকে দীর্ঘদিন।

ছাত্র-ছাত্রী বা শিক্ষক কেউ বলবে না যে এগুলো পরীক্ষায় থাকবে না, কিংবা স্পোকেন ইংরেজির উপর পরীক্ষা হবে না, আমরা এগুলো কেন শিখব? তার সিলেবাসে লিখিত পরীক্ষার অভ্যাস স্পোকেন ইংরেজির মাধ্যমেই করছে। ক্লাস হচ্ছে আনন্দময়, তারা অযথা সময় নষ্ট করবে না, দুষ্টুমি করবে না, বাইরে অযথা তাকাবে না আর ক্লাসও বোরিং মনে হবে না কারণ শিক্ষার্থী বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করছে।

প্রশ্ন হচ্ছে, একজন শিক্ষক কীভাবে রপ্ত করবেন এসব ক্লাসরুম ল্যাংগুয়েজ। এখানে ক্লাসরুম ল্যাংগুয়েজের কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া হলো। কোনো নতুন পাঠ শুরু করার আগে বলবেন, Dear students, open at page 30, have you opened it? You have opened? Fine, thank you. Now let us start our lesson. Well? এভাবে চেক করবেন সাথে সাথে যাতে শিক্ষার্থীরা ল্যাংগুয়েজটি শিখতে পারে। নির্দিষ্ট পাঠ শেষ করে বই বন্ধ করতে বলবেন এভাবে Please close the book. I have closed the book, have you? শিক্ষার্থীদের দেখাবেন যে, আপনি বই বন্ধ করছেন। এভাবে আপনার সংস্পর্শে এসে আপনার ক্লাসে এসে আপনার উৎসাহে তারা স্পোকেন ইংরেজি অর্থাৎ ভাষা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করার সুযোগ পাবে এবং শিখবে।

কোনো পাঠ আর পড়াবেন না বা একটি নির্দিষ্ট স্থানে শেষ করতে চান, তাহলে বলবেন Let us close the chapter here/should we go further? Can we stop it here? Yes or no?

শিক্ষার্থীরা যখন উত্তর দিবে, তাদের ধন্যবাদ দিন। a lot of thanks. / Thank you.

স্পিকিং স্কিল ক্লাসে কেন অভ্যাস করা হয় না?

প্রথমত, স্পিকিংয়ের ওপর অভ্যন্তরীণ কিংবা জাতীয় পর্যায়ে কোনো ধরনের পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় না এবং কোনো ধরনের নম্বর থাকে না। তাই শিক্ষক ও

www.pathagar.com

শিক্ষার্থী কেউই বিষয়টিতে কোনো ধরনের আগ্রহ দেখায় না বা গুরুত্ব প্রদান করে না।

দ্বিতীয়ত, স্পিকিং করার জন্য ভাষার ওপর যথেষ্ট দখল থাকতে হয়। মৌখিকভাবে ভাব-আদান প্রদানের জন্য ভাষায় যতটুকু দক্ষতা থাকা দরকার ততটুকু দক্ষতা শিক্ষার্থীদের তো দূরের কথা, শিক্ষকদেরই নেই। অতএব তারা স্পিকিং স্কিলে আগ্রহ প্রকাশ করে না।

২০১৩ সালের নতুন কারিকুলামে শিক্ষার্থীদের ১০ নম্বরের স্পোকেন ইংরেজি পরীক্ষা দিতে হবে। এটি একটি ভালো পদক্ষেপ।

তৃতীয়ত, ক্লাসরুম ছাড়া তো ইংরেজিতে কথা বলার আর তেমন সুযোগ নেই, এটি বাস্তব কারণেই।

কালচারাল বা সাংস্কৃতিক বাধা। আমাদের সংস্কৃতিতে বিশেষ করে গ্রামে এখনও ইংরেজিতে কিছু একটা বলতে শুরু করলে সহপাঠীসহ আশপাশের সবাই হাসাহাসি শুরু করে। ফলে ইংরেজি বলতে অনেকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না।

আর একটি কারণ হচ্ছে, শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সবাই মনে করেন যে ভুল ইংরেজি বললে সবাই সমালোচনা করবে, হাসাহাসি করবে তার চেয়ে না বলাই ভালো। এই না বলতে বলতে চর্চা একেবারেই হচ্ছে না। আর ভাষা চর্চা না করলে তো আগাবে না। টুকটাক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী ইংরেজি বলে না। এ অবস্থায় শিক্ষকদের কী করতে হবে?

শিক্ষককে ক্লাসে ইংরেজি বলতে হবে। যেহেতু তার ইংরেজি বলার অভ্যাস নেই, তাই বাসায় তাকে পূর্ব থেকেই অভ্যাস করতে হবে। শিক্ষক হয়তো মনে করতে পারেন যে, আমি যে বেতন পাই তাতে এত কষ্ট করার দরকার কী? আসলে এই পরিশ্রম বৃথা যাবে না একজন শিক্ষকের। কারণ ইংরেজি বলায় পারদর্শিতা অর্জন করলে সেটি হবে আপনার নিজস্ব সম্পদ। এই সম্পদ কেউ আপনার কাছ থেকে নিতে পারবে না। আপনার সংস্পর্শে এসে শিক্ষার্থীরাও ইংরেজি শিখবে, আপনার ক্লাসে আসার আগ্রহ প্রকাশ করবে।

www.pathagar.com

কীভাবে শিখবেন স্পোকেন ইংরেজি

আধুনিক যুগ কমিউনিকেশনের যুগ। এ কমিউনিকেশন হচ্ছে ভাষাগত যোগাযোগ। এ যোগাযোগ আমরা প্রধানত চার প্রকারে করে থাকি।

ইংরেজির চারটি দক্ষতার মধ্যে স্পোকেন ইংরেজি অন্যতম একটি দক্ষতা। যে কোনো অফিস, বেসরকারি সংস্থা ও এনজিওতে চাকরি পাওয়ার জন্য স্পোকেন ইংরেজি একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। আসলেই এটি একটি প্রশংসনীয় গুণ, যিনি সুন্দরভাবে ইংরেজিতে কথা বলতে পারেন। তার কদর এবং চাহিদা প্রায় সর্বত্রই। এই সুবাদে দেশের আনাচে-কানাচে গড়ে উঠেছে ইংরেজি শেখানোর কোচিং সেন্টার। বিভিন্ন ধরনের আকর্ষণীয় বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে তারা প্রার্থীদের প্রলোভিত করার চেষ্টা করে। কেউ কেউ বলেন "দ্বিতীয় ঘণ্টা থেকে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলুন।" আবার কেউ কেউ বলেন, "দুই সপ্তাহে ইংরেজিতে কথা বলা শিখুন।" আমাদের দেশের ছেলে-মেয়েরা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে ইংরেজি পড়েছে, তার পরেও তারা ইংরেজিতে দুর্বল থাকে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কোচিং সেন্টার কীভাবে দুঘণ্টায় কিংবা দুসপ্তাহে ইংরেজি বলার নিশ্চয়তা দেয়?

স্পোকেন ইংরেজি শেখা ইংরেজির চারটি দক্ষতা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যাপার নয়। স্পোকেন ইংরেজি শেখার সাথে সাথে আপনাকে বাকি তিনটি বিষয়েও দক্ষতা অর্জন করতে হবে। আপনার vocabulary প্রচুর বাড়াতে হবে। কীভাবে বাড়াবেন আপনার vocabulary, শুধু ডিকশনারি মুখস্থ করবেন? শুধু ডিকশনারি মুখস্থ করে শব্দের অর্থ জানলেই হবে না। vocabulary অর্থ হচ্ছে শব্দের সঠিক প্রয়োগ জানা আর এটা জানার জন্য আপনাকে প্রচুর ইংরেজি পড়তে হবে কিন্তু আপনার এত পড়ার সময় কই? হ্যাঁ, আপনাকে এক্ষেত্রে ইংরেজি পত্রিকা পড়তে হবে। বাংলা পত্রিকার সাথে আপনি ইংরেজি পত্রিকা পড়ুন, তাতে সহজেই বুঝতে

www.pathagar.com

পারবেন অনেক ঘটনা, অনেক বিষয় যেগুলো পত্রিকায় লেখা থাকে। কোচিং সেন্টারে দৌড়াদৌড়ি না করে একটি বাংলা ও একটি ইংরেজি পত্রিকা পাশাপাশি পড়ুন, দেখবেন আপনার ইংরেজির ভাষাজ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হবে এবং ইংরেজি ব্যবহারের দক্ষতা বেড়ে যাবে বহুগুণ। এতে আপনার পত্রিকা পড়ে খবরাখবর জানাও হবে আবার ইংরেজিও পড়া হবে।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা অতটা বাস্তবমুখী নয় বলে আমরা ইংরেজি বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে উচ্চমাধ্যমিক কিংবা স্নাতক পর্যায় পর্যন্ত পড়ার পরেও পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর ছাত্র-ছাত্রীদের মতো কথা বলতে পারি না। অথচ স্নাতক ডিগ্রি কিংবা মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়ার পর যখন চাকরির প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হতে হয়, তখন স্পোকেন ইংরেজিতে দক্ষতা পরীক্ষা করা হয়। কোনো কোনো চাকরিতে সরাসরি এ গুণ দরকার হয়।

স্পোকেন ইংরেজি শিখতে হলে আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, লক্ষ্য স্থির করতে হবে, ধৈর্যশীল হতে হবে, নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করতে হবে এবং ভালো কোনো শিক্ষকের পরামর্শ নিতে হবে।

আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে, কারণ আপনি আসলেই কি ইংরেজি শিখতে চান? যদি চান তাহলে আপনাকে দৃঢ় মনোবলের অধিকারী হতে হবে। আপনাকে ধৈর্যশীল হতে হবে এজন্য যে চার থেকে ছয় মাস পর্যন্ত আপনাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনাকে পরিচিত হতে হবে বিভিন্ন ধরনের sentence structure-এর সাথে, আর এসব কিছু করার জন্য আপনার থাকতে হবে একজন ভালো শিক্ষকের সংস্পর্শে।

যিনি শুধু কাজ চালানোর মতো স্পোকেন ইংরেজি শিখেছেন, তিনি তার কাজ চালানোর মতো ইংরেজি হয়তো শিখেছেন তা দিয়ে তিনি আপনাকে ইংরেজি শেখাতে পারবেন না। কারণ ভাষা শিখতে গিয়ে আপনি অনেক জটিল প্রশ্নের মুখোমুখি হবেন, যার উত্তর তিনি দিতে পারবেন না। আর আপনি অন্ধের মতো কিছু শিখতে রাজি হবেন না নিশ্চয়ই। সঠিক উত্তর না পেলে আপনি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। এ অবস্থা আপনার শিক্ষাকে বাধাগ্রস্ত করবে।

আপনাকে বুঝতে হবে বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। প্রকৃতিগতভাবেই আমরা এ ভাষা শিখি আর তাই এ ভাষার উপর আমাদের দখল থাকে। এ অবস্থায় অন্য একটি ভাষা vocal chord -এ ঢোকানো খুবই কষ্টকর।

www.pathagar.com

ইংরেজি পরিবেশ থেকে শিখতে হয়। কিন্তু আমাদের তো এরকম পরিবেশ নেই। হ্যাঁ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষক জানেন কীভাবে ইংরেজি পরিবেশ সৃষ্টি করে ইংরেজি শেখাতে হয়।

স্পোকেন ইংরেজি ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে এটি অন্যতম, স্পোকেন ইংরেজির সাথে সাথে আপনাকে অন্য তিনটি দক্ষতা কমবেশি– ইংরেজির শব্দভাণ্ডার বাড়ানো এবং দক্ষতা বাড়ানোর জন্য অবশ্যই আপনাকে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। আর এই পড়ার অভ্যাসের মাধ্যমে আপনার কথা বলার ক্ষমতাও বাড়বে।

কোনো বিষয় পড়ে আপনি কতটা বুঝেন, তা পরীক্ষা করার জন্য আট ধরনের popular টেস্ট রয়েছে। এ টেস্টগুলো আপনার স্পোকেন ইংরেজির ক্ষেত্রে খুবই জরুরি। আপনাকে রিডিং কমপ্রিহেনশন থেকে sentence পিক আপ করতে হবে। এ রিডিং কমপ্রিহেনশন করার জন্য আপনি নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা পড়বেন। তাহলে আপনার একসাথে দুই কাজ হবে, সংবাদও পড়া হবে ইংরেজিও চর্চা হবে। পত্রিকা পড়ার সময় অনেক নতুন নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হবেন। এই শব্দগুলোর অর্থ বুঝার জন্য অক্সফোর্ড ডিকশনারি ব্যবহার করবেন। এই ডিকশনারিতে শব্দের প্রয়োগ দেখানো আছে। ইংরেজি শব্দের শুধু অর্থ বুঝলে হবে না, ওই শব্দের বাক্যে প্রয়োগও জানতে হবে। ইংরেজি পত্রিকা পড়ার সাথে সাথে বাংলা পত্রিকাও পড়বেন তাহলে অনেক কিছু বুঝতে আপনার সুবিধা হবে।

প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় করে নিজে নিজে ইংরেজি বলুন। পরিচিত পরিবেশ থেকে কোনো ঘটনা নিয়ে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ইংরেজি বলার চেষ্টা করুন। সম্ভব হলে– TOEFL এবং IELTS-এর ক্যাসেট ক্রয় করে বাসায় একই ক্যাসেট বারবার শুনুন, দেখবেন আপনার Listening এবং Speaking skill অনেক বেড়ে যাবে।

প্রতিদিন বিদেশি এবং দেশি চ্যানেলের ইংরেজি সংবাদ নিয়মিত শুনুন। যখন দেখবেন আপনার বুঝার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে, তখন বিদেশি চ্যানেলের সংবাদসহ বিদেশি ফিল্মগুলো দেখুন। এভাবে অনুশীলন চালিয়ে গেলে একসময় দেখবেন আপনার ইংরেজি বলার এবং বুঝার ক্ষমতা অনেক বেড়ে গেছে। আপনার আত্মবিশ্বাস অনেক বেড়ে যাবে। এ আত্মবিশ্বাসই আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে নেবে। আপনি চেষ্টা চালিয়ে যান অবশ্যই সফলকাম হবেন।

www.pathagar.com

গল্পের মাধ্যমে ইংরেজি ক্লাস

একজন শিক্ষকের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে একই ক্লাসে বিভিন্ন ধরনের ছাত্র-ছাত্রীর আগ্রহ ধরে রাখা এবং ক্লাসকে আকর্ষণীয় করা। ক্লাসকে আকর্ষণীয় করতে সমর্থ হলে শিক্ষার্থীরা সহজেই ক্লাসে আসবে। ক্লাসে শুধু পড়ালে শিক্ষার্থীরা বিরক্তি অনুভব করবে। আবার শুধু গল্প বললেও ভালো শিক্ষার্থীরাই নয় বরং মধ্যম মানের ছাত্র-ছাত্রীরাও একসময়ে মনে করবে যে, ঐ ক্লাসে তাদের শুধুই সময় নষ্ট হচ্ছে। আবার একজন শিক্ষক যত ভালোই পড়ান না কেন, প্রতিদিন যদি একই ধরনের পাঠদান করেন, তা হলেও শিক্ষার্থীরা বোরিং অনুভব করবে। আর তাই একজন শিক্ষককে সব সময় এই বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে এবং রীতিমত গবেষণা করতে হবে। পড়াশুনা করতে হবে এ বিষয়ে বিভিন্ন লেখা।

শিক্ষকদেরকে নিজেদের এমনভাবে গড়ে তুলতে হবে; যেন তার ক্লাসে কী হচ্ছে, তাদের শিক্ষার্থীরা কীভাবে ইংরেজি শিখছে এবং আসলেই কোনো দক্ষতা অর্জন করছে কি না তা জানতে অভ্যস্ত হন। শিক্ষক যেন, সমালোচনামূলক মূল্যায়ন করতে জানেন এবং একইভাবে তা তার নিজের ক্লাসে অনুশীলন করতে পারেন। শিক্ষকগণ নিজেরা যেন নিজেদের অনুশীলন ও ক্লাস সম্পর্কে সমালোচনা করতে জানেন, তাহলেই তারা প্রকৃত এবং উন্নতমানের শিক্ষক হতে পারবেন।

শিক্ষক সর্বদাই নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বেন, পুরনোগুলো থেকে উত্তরণের পরপরই নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে। তখন অর্জিত নতুন দক্ষতার দ্বারা সেগুলো মোকাবিলা করার চেষ্টা করবেন। এভাবে বিশাল এবং বিভিন্ন মাত্রার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার শক্তি আপনাকে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতার অধিকারী করবে এবং জানার এবং শেখার বিশাল জগতে নিজেকে প্রবেশ করাতে পারবেন। আপনি নিত্যনতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করবেন ইংরেজি পড়ানোর, তাহলে দেখবেন শিক্ষার্থীরা আপনার ক্লাসে বিরক্তি অনুভব করবে না বরং তারা আপনার ক্লাসের

www.pathagar.com

জন্য উদগ্রীব হয়ে অপেক্ষা করবে। কারণ তারা জানে আপনি তাদের সিলেবাসে যাই শেখাবেন তা হবে নতুন ধরনের, নতুন মাত্রার এবং আনন্দদায়ক। এ ধরনের একটি পদ্ধতির আলোচনা আজ আমি করতে যাচ্ছি। আর সেটি হচ্ছে গল্প বলার মাধ্যমে ইংরেজি শেখানো।

গ্রামার শেখান এবং দক্ষতা বৃদ্ধি গল্প বলার মাধ্যমে:

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ছোট একটি গল্প বলবেন। গল্প বলার পূর্বেই শিক্ষার্থীদের বলবেন যে তিনি তাদেরকে একটি প্রশ্ন করবেন গল্পের ওপর। এতে শিক্ষার্থীরা পূর্ব থেকেই সতর্ক থাকবে এবং অধিক মনোযোগ সহকারে গল্পটি শুনবে। তাদের একাগ্রতা যেমন বাড়বে, তেমন শ্রবণ দক্ষতা তাদের অজান্তেই বেড়ে যাবে। এতে আপনি আর একটি ফল পাবেন আর তা হচ্ছে নতুন কিছু শোনার জন্য শিক্ষার্থীর সব সময়ই উদগ্রীব থাকে। ক্লাস ম্যানেজমেন্টও আপনাকে ঐ সময়ে অন্য কোনো পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে না।

গ্রামার এবং লেখার দক্ষতা :

শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেকোনো একজনকে একটি গল্পের প্রথম প্যারাগ্রাফটি লিখতে বলবেন বোর্ডে। এবার তার লেখা প্যারাগ্রাফের ওপর ভিত্তি করে বাকি শিক্ষার্থীরা একজন একজন বোর্ডে এসে প্রথম শিক্ষার্থীর মতো এক প্যারা করে করে লিখে একটি পূর্ণ গল্প বোর্ডে লিখবে। লিখতে শিক্ষার্থীরা ইতস্তত করবে, কারণ লেখার তাদের অভ্যাস নেই, তাছাড়া প্রচুর ভুল লিখবে, তাই সহজে বোর্ডে আসতে চাইবে না। তাদের বোর্ডে আসতে উৎসাহিত করুন এবং লেখার সময়ও সহযোগিতা করুন। পুরো গল্পটি লেখা হলে একজন-দুজন শিক্ষার্থীকে বিশেষ কোনো একটি গ্রামারের গঠন নির্দেশ করতে বলবেন। সেটি হতে পারে preposition/ passive voice/ past perfect/ tense ইত্যাদি যেকোনো একটি। শিক্ষার্থীদের ভুল করাটা স্বাভাবিক, আপনি এবার ঐ ভুলগুলো গ্রামারের পয়েন্ট ধরে আগাবেন, গ্রামার বুঝাবেন এবং শুদ্ধ করবেন। এভাবে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সৃষ্টিশীল লেখায় মনোনিবেশ করবে, তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি করার সুযোগ পাবে। সাথে সাথে নির্দিষ্ট কোনো গ্রামার পয়েন্টের ব্যাখ্যা শিক্ষকদের কাছ থেকে এবং বাস্তব উদাহরণের মাধ্যমে যখন শিক্ষার্থীরা শিখবে, তখন তা অনেক প্রাণবন্ত এবং অধিক কার্যকরী হবে। এভাবে গ্রামার শেখা এবং শেখানো অধিকতর বাস্তবসম্মত এবং কার্যকরী।

www.pathagar.com

একটি ছোট গল্প ক্লাসের সবাইকে একে একে পড়তে বলবেন। অনেক শিক্ষার্থীই অনেক শব্দ সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে জানে না, আপনি তাদেরকে সহায়তা করুন। আপনার সঠিকভাবে উচ্চারিত শব্দগুলোর প্রয়োগ শিক্ষার্থীদের লক্ষ করতে বলুন। কী অর্থে, কীভাবে বাক্যে শব্দগুলোর প্রয়োগ বা ব্যবহার হচ্ছে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এলিসিটশন পদ্ধতিতে বের করার চেষ্টা করুন। পরে আপনি তাদেরকে আরও দু-একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন। এতে শিক্ষার্থীদের পড়ার দক্ষতা বেড়ে যাবে এবং শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পাবে।

গল্পটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের একটি কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্ন করুন। তাদেরকে মৌখিকভাবে উত্তর দিতে বলুন। এবার শিক্ষার্থীদের জুটিতে বা দলগতভাবে গল্পটির প্লট বা অন্যদিক সম্পর্কে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করতে বলুন। এতে একদিকে যেমন তাদের বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, তেমন তাদের বিশ্লেষণধর্মী দক্ষতাও বাড়বে। সাথে সাথে দর্শকদের মাঝে বা সামনে ইংরেজি বলার যে ভীতি থাকে শিক্ষার্থীদের, তাও দূর হবে।

শিক্ষার্থীরা যখন গল্পটি বোর্ডে লিখবে, শিক্ষক ভাষাগত এবং সন্নিবেশগত সংশোধন করে দিতে পারেন। আবার তাদের সাজিয়ে এবং শুদ্ধ ইংরেজিতে নিজেদের খাতায় লিখতে বলুন। এতে তাদের সাজানোর দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ব্যস্ত থাকবে।

গল্পের মাধ্যমে আপনি গ্রামার শেখাচ্ছেন, ট্রাডিশনাল পদ্ধতিতে নয়। শিক্ষার্থীরা মনের আনন্দে গল্প শুনে, গল্প বলে গল্প লিখে তাদের মনের অজান্তেই গ্রামার শিখে যাবে। এটি ভাষার চারটি দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একটি 'মোটিভেটিং' পদ্ধতি। আর বাস্তবসম্মতভাবে শিক্ষার্থীদের গ্রামার শেখানোর পদ্ধতি। এ পদ্ধতি গ্রামারের গঠনপ্রকৃতি জানার সাথে সাথে ভাষার চারটি দক্ষতার সাথে শব্দভাণ্ডার গঠন এবং সাজানোর পদ্ধতির দক্ষতাও বাড়াতে যথেষ্ট সহায়তা করে। ক্লাস ইন্টারঅ্যাকটিভ এবং আকর্ষণীয় করার জন্য এটি একটি উত্তম পদ্ধতি। ইংরেজি শিক্ষকগণ পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।

www.pathagar.com

সাধারণ জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে কীভাবে ইংরেজি পড়াবেন

আমরা যখন ভাষা শিখি কিংবা শিক্ষার্থীদের ক্লাসে শেখাই, পারিপার্শ্বিক বা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো উপেক্ষা করতে পারি না। বরং ঐ ঘটনাগুলো বারবার আমাদের নাড়া দেয়, আমাদের নিত্যদিনের পাঠদানকে প্রভাবিত করে। দৈনন্দিন কার্যাবলি করার সময়ে এবং ক্লাসে আমরা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আলোচনা করি, না করে পারি না কারণ সচেতন মানুষ হিসেবে এটি প্রাকৃতিক তাগিদ এবং চাহিদা। এই আলোচনাগুলোকে আমরা ইংরেজি শেখানোর কাজে লাগাতে পারি।

যেমন আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো আমরা রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানি, উত্তেজিত হই, প্রতিক্রিয়া জানাই, মতামত প্রকাশ করি, আলোচনা-সমালোচনা করি, পক্ষে-বিপক্ষে কথা বলি, বিতর্ক করি এগুলো নিয়ে। এই বিষয়গুলোই আমরা ভাষা শিখানোর ক্লাসে এবং গ্রামার শেখানোর ক্লাসে কাজে লাগাতে পারি। এতে কয়েকটি প্রত্যক্ষ উপকার হবে।

(১) একজন শিক্ষক সুন্দরভাবে ক্লাস ম্যানেজ করতে পারবেন
(২) শিক্ষার্থীরা আগ্রহভরে ঐ ক্লাস করবে এবং অত্যন্ত মনোযোগী থাকবে শ্রেণিকক্ষে কারণ এটি তাদের বাস্তব জীবনের সাথে জড়িত
(৩) একজন শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, কারো জন্যই ক্লাস বোরিং হবে না, বরং আনন্দময় হবে আর ক্লাসকে আনন্দময় করে তোলা একজন সার্থক শিক্ষকের কাজ
(৪) শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক উভয়ের জন্য সাধারণ জ্ঞানের চর্চা হবে
(৫) শিক্ষা হবে বাস্তবভিত্তিক এবং অধিকতর ফলপ্রসূ
(৬) অহেতুক সময় নষ্ট হবে না ক্লাসে এবং এ কথা কেউ মনেও করতে পারবে না যে ক্লাসে অপ্রাসঙ্গিক গল্প করা হয়েছে।

www.pathagar.com

যেমন (আগস্ট ২০১১) মাসে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ঘটে গেছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সবগুলোই আমাদের নিত্যদিনের আলোচনার বিষয়। সবগুলোই রেডিও, টেলিভিশন ও সংবাদপত্রের হেডলাইন। আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে কোনোটিই আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। কোনো না কোনোভাবে আমরা এগুলোর সাথে জড়িয়ে আছি। যেমন–

(ক) ভারতে দুর্নীতি দমনের জন্য পার্লামেন্টে আইন পাসের জন্য গান্ধীবাদী সমজাকর্মী আন্না হাজারে একটানা ১২ দিন অনশন করেছেন নয়াদিল্লির রামলীলা ময়দানে। দেশব্যাপী হাজার হাজার সমর্থক, ছাত্র-শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী, কৃষক, মজুর, শিল্পী সবাই তাকে সমর্থন জানিয়েছেন এবং তার সাথী হয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার বাধ্য হয়েছে বিষয়টি সংসদে উত্থাপন করতে।

(খ) লিবিয়ায় ৪২ বছর ধরে ক্ষমতায় থাকা কর্নেল মুয়াম্মার গাদ্দাফির বিরুদ্ধে বিদ্রোহীরা ফেব্রুয়ারি মাস থেকে সশস্ত্র সংগ্রাম করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। গাদ্দাফি কোথায় পালিয়েছেন, তার সঠিক কোন ঠিকানা কেউ আবিষ্কার করতে পারছে না। বিদ্রোহীরা ২৬ আগস্ট ত্রিপোলি দখল করে নিয়েছে। ৩০ আগস্ট টেলিভিশনের জানা গেল তার পরিবার আশ্রয় নিয়েছে আলজেরিয়ায়। তার পরে জানা গেল গাদ্দাফি তার অনুগত বাহিনী নিয়ে তার নিজ শহরে আশ্রয় নিয়েছে।

(গ) নেপালে ৩৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ২৮ আগস্ট শপথ নিয়েছেন মাওবাদী নেতা বাবুরাম ভট্টরাই। ১০ বছর সশস্ত্র সংগ্রাম করে মাওবাদীরা ২০০৬ সালে নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতিতে চলে আসে, কিন্তু রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আসেনি দেশটিতে। পুষ্পকমল দাহল প্রচন্ড প্রধানমন্ত্রী হন কিন্তু মাওবাদীদের দেওয়া কিছু শর্ত পূরণ করা হয়নি বলে তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

(ঘ) জাপানে পাঁচ বছরের মধ্যে ৬ষ্ঠ বারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ইয়োশিহিকো নোদা। পূর্ববর্তী প্রধানমন্ত্রী নাওতো কান মাত্র ১৫ মাস ক্ষমতায় ছিলেন। গত মার্চ মাসে প্রবল ভূমিকম্পে ও সুনামিতে আক্রান্ত হয় দেশটি। ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যায় দেশের প্রধান কয়েকটি পারমাণবিক চুল্লি। এই পরিস্থিতি ফলপ্রসূভাবে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হন নাওতো কান। তার নিজ দল ডেমোক্রেটিক পার্টি অব জাপান এবং বিরোধী দল লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে চাপ আসে, পরে তিনি ২৭ আগস্ট পদত্যাগ করেন।

এভাবে প্রতি সপ্তাহে এবং প্রতি মাসে বিশ্বের কোথাও না কোথাও কোনো উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে থাকে। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার চোখ-কান খোলা রাখতে হবে, জানতে হবে কোথায় কী ঘটছে, সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য

www.pathagar.com

ঘটনাবলির সাথে আপনার নিবিড় পরিচিতি থাকতে হবে। গ্লোবালাইজেশনের যুগে একজন শিক্ষককে কূপমণ্ডূক হলে চলবে না। মনে রাখবেন, অনেক শিক্ষার্থীই তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে সাম্প্রতিককালের ঘটনাবলির খোঁজখবর রাখছেন। তাদের মধ্যে এগুলো জানার, আলোচনা করার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে, তারা চান তাদের শিক্ষকও বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করুক। কিন্তু অনেক শিক্ষক আছেন এসব বিষয় নিজে তো আলোচনার ধারে কাছেও যান না। কোনো শিক্ষার্থী এসব বিষয় ক্লাসে তুললে তাকে ভর্ৎসনা করেন, এমনকি অনেক সময় শাস্তিও প্রদান করে থাকেন। ফলে ঐ ক্লাস আনন্দময় এবং বাস্তবধর্মী না হয়ে নিরানন্দ হয়ে থাকে। শিক্ষার্থীরা আগ্রহ প্রকাশ করে না ঐসব ক্লাসে উপস্থিত হতে। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনার বড় উপহার হচ্ছে আপনি যখন সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোকে ক্লাসের পাঠদানের সাথে মেলাতে পারবেন। আপনি যখন শিক্ষার্থীদের সাম্প্রতিক ঘটনার ওপর কোনো প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তখন আপনার প্রতি তাদের আস্থা, বিশ্বাস, বন্ধুত্ব ও শ্রদ্ধা বহুগুণ বেড়ে যাবে, যা শিক্ষাদানের পরিবেশকে আরও উন্নত, কার্যকরী ও ফলপ্রসূ করবে। একজন শিক্ষক হিসেবে আপনি তা আশা করেন না?

কীভাবে আপনি এটি করবেন?

আপনি শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কমপক্ষে দুটি ইংরেজি পেপার নিজে পড়বেন, একটি বাংলা পত্রিকা পড়বেন। আপনার ফোকাস থাকবে আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ওপর। আপনি কয়েকবার ঘটনাগুলো পড়ুন, অজানা শব্দগুলো প্রসঙ্গ থেকে বুঝার চেষ্টা করুন। বুঝতে অসুবিধা হলে অক্সফোর্ড ডিকশনারি ব্যবহার করুন। বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝে নিন, যাতে আপনি কমেন্ট করতে পারেন আপনার পঠিত বিষয়গুলোর ওপর। ক্লাসভেদে এবং আপনার পড়ানোর নির্দিষ্ট বিষয় আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নিন। ক্লাসে ঢুকে ওয়ার্মিং আপ প্রাকটিস হিসেবে শিক্ষার্থীদের মাঝে দুটো একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করুন। দেখুন কতজন শিক্ষার্থী ব্যাপারটি জানে। দু-চারজন জানলে তাদেরকে প্রশ্ন করুন। পত্র-পত্রিকার সাথে আপনার মতামত যুক্ত করুন। এখান থেকেই আপনি তাদের ট্রান্সফরমেশন করান, প্রশ্নবোধক বাক্য গঠন শেখান, সারমর্ম লিখতে দেন, বাক্য পূর্ণকরণ লিখতে দেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে তাদের স্পিকিং উন্নত করান, আর্টিকেল করান, ভয়েস চেইঞ্জ শেখান, প্রিপজিশন শেখান। এভাবে গ্রামার ও ল্যাংগুয়েজ প্রাকটিসের সাথে সাথে সাধারণ জ্ঞানের চর্চা হবে এবং ক্লাসের কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা যাবে। পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরাও সহজে অংশগ্রহণ করতে পারবে।

www.pathagar.com

মাইমিংয়ের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা

ভাষা শিক্ষাদানের জন্য নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করছেন ভাষাবিজ্ঞানী এবং গবেষকগণ। এগুলোর অনুসরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেমন আনন্দ পাবে, তেমনি ভাষা শিক্ষা সহজ, সুন্দর ও আনন্দময় হবে। মাইমিং এমন একটি পদ্ধতি।

একজন শিক্ষক হিসেবে এগুলোর সাথে আপনাদের পরিচিতি থাকতে হবে।

আপনি শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করতে পারেন, তোমরা কি অনুমান করতে পার আমি আজ বিকেলে কী করব। শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করবে, আপনি সেগুলো বোর্ডে শুদ্ধ লিখুন এবং উত্তরগুলোও লিখে রাখুন। তাদেরকে সেগুলো দেখে দেখে প্রশ্ন করতে বলুন।

তাদের প্রশ্নগুলো শুনুন, তারপর আপনি মাইমিং করে দেখান কীভাবে আপনি টেলিভিশন দেখবেন। তখন সমস্ত শিক্ষার্থীরা একসাথে বলে উঠবে এবং আপনি টেলিভিশন দেখবেন আজ বিকেলে।

তারা ভুল করবে আপনি বলে দিবেন শুদ্ধ ইংরেজিতে। এতে তাদের একদিকে প্রশ্নবোধক বাক্য তৈরি করার ক্ষমতা বাড়বে, অন্যদিকে টেন্স ব্যবহার করার ক্ষমতা বাড়বে।

ধরুন, আপনি প্রিপজিশন পড়াবেন। বহু পদ্ধতি আছে। কিন্তু সব পদ্ধতি একসাথে ব্যবহার করলে কিংবা একই পদ্ধতি বারবার ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীদের কাছে বিরক্তিকর লাগতে পারে। তাই জেনে রাখুন বিভিন্ন ধরন।

যেমন শিক্ষার্থীদের খাতায় কিংবা এক পিস কাগজে বলুন draw a house at the centre of the paper. Draw a tree behind the house. Draw a pond in front of the house. Now colour the sky over the house. Make a

www.pathagar.com

cowshed near the house. Draw some furniture inside the house. Make fishes swim in the pond.

দেখবেন পুরো ক্লাস হাসাহাসি করবে, মজা করবে, একে অপরের ছবি দেখে হাসবে, মন্তব্য করবে। ছবি আঁকানো বা চিত্রশিল্পী বানানো আপনার উদ্দেশ্য নয়, আপনার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মজায় মজায় শিক্ষার্থীদের প্রিপজিশন শেখানো। দেখবেন শিক্ষার্থীর তাদের অজান্তেই তারা প্রিপজিশন শিখে ফেলেছে এবং অনেক দিন মনে থাকবে এভাবে শিখলে।

এভাবে জিজ্ঞেস করুন আপনি কোথায় আছেন? তারা উত্তর দিবে ভুল উত্তর দিলে আপনি বলে দিবেন I am on the platform. Where we are now. We are now in the class. They are learning not only preposition but also good, practical and everyday use sentences.

Where are you writing? We are writing in the scripts.

মাইমিং করে দেখান যে আপনি লিখছেন। এ ধরনের বাস্তবভিত্তিক শেখা অধিকতর ফলপ্রসূ।

www.pathagar.com

ইংরেজি / দ্বিতীয় ভাষা সচেতনভাবে না অবচেতনভাবে শিখব?

ভাষা শিখতে হবে অবচেতনভাবে, সচেতনভাবে নয়। গবেষণায় দেখা গেছে, অবচেতনভাবে ইংরেজি শেখা সচেতনভাবে শেখার চেয়ে অনেক ভালো। অসংখ্য স্টাডিতে দেখা গেছে যেসব শিক্ষার্থী অবচেতনভাবে ইংরেজি শিখে, তারা দ্রুত এবং অধিকতর বাস্তবসম্মতভাবে ইংরেজি শিখতে পারে। আর যারা ট্রাডিশনাল, সচেতন, বিশ্লেষণধর্মী পদ্ধতিতে ভাষা শিখে, তারা প্রথম গ্রুপের মতো তত দ্রুত ভাষা আয়ত্ত করতে পারে না। কিন্তু সঠিকভাবে আমরা সচেতনভাবে এবং অবচেতনভাবে বলতে কী বুঝি?

সচেতনভাবে বলতে বুঝি সতর্কতার সাথে ইংরেজি গ্রামার বিশ্লেষণ করা, ইংরেজি শব্দভাণ্ডার মুখস্থ করা এবং ইংরেজির তথ্যগুলোকে বাংলায় ভাষান্তর করা। আমরা সচেতনভাবে ইংরেজির যন্ত্রপাতি ব্যবহারে নিয়ে অধ্যয়ন করি, যেন ভাষা একটি গাড়ি। ইংরেজি কাট আপ করে অংশগুলো মনে বসানো, অক্ষরে অক্ষরে, নিয়মের পর নিয়ম ব্যবহার করে। ফল হচ্ছে, এভাবে একজন শিক্ষার্থী প্রচুর গ্রামারের নিয়ম জানে, ভাষান্তর করতে পারে কিন্তু সে ভালোভাবে কথা বলতে পারে না এবং ইংরেজি ভাষার কোনো লোকের কথা বুঝতে পারে না।

অবচেতনভাবে ভাষা শেখা খুবই ফলপ্রসূ। এই পদ্ধতি বোধগম্য ইংরেজি ইনপুট আমাদের ব্রেইনে প্রবেশ করায়, বাকি কাজগুলো অবচেতন ব্রেইন করে ফেলে। সচেতনভাবে আমরা ইংরেজি গল্প, আর্টিকেল, কথোপকথন, ছবি এবং উপন্যাস উপভোগ করি। এখানে আমরা কখনও গ্রামার নিয়ে চিন্তা করি না, বা কোনো শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা করি না।

বেশি কষ্ট না করে ইংরেজি শেখার পদ্ধতিই হচ্ছে অবচেতনভাবে শেখা। তবে অনেক শিক্ষার্থী অবচেতনভাবে ইংরেজি শিখতে ভয় পায় কারণ তারা নিজেদের

www.pathagar.com

ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না। তারা রিলাক্স মুডে এবং মজা করে ইংরেজি শিখতে ভয় পায়। তারা প্রাকৃতিকভাবে এবং বিনা কষ্টে ইংরেজি শিখতে ভয় পায়। সত্যিকার অর্থে এ ধরনের শিক্ষার্থীরা ভালো ইংরেজি শিখতে পারে না।

প্যাটেন্টটেড ভাষা ব্রিজ পদ্ধতি অধিকতর কার্যকরী লিডিং পদ্ধতির চেয়ে। আমরা বিশ্বাস করি যে আমরা করে করে শিখি। ভাষা অ্যাকয়ার করা বা শেখা গ্রামারের বহুল ব্যবহার দরকার হয় না, প্রয়োজন পড়ে না ক্লান্তিকর গ্রামারের ড্রিল বা এক্সারসাইজ। এটি রাতারাতি অর্জন সম্ভব নয়। সত্যিকার ভাষা অ্যাকোয়ার করা ধীরে ধীরে অর্জিত হয়, কথা বলার দক্ষতা বৃদ্ধি পায় যথেষ্ট পরিমাণে এবং যে পদ্ধতি টায়ারজাম নয়, শিক্ষার্থী পছন্দ করে, সে ধরনের এক্সারসাইজ ব্যবহার করতে হবে।

মুটিভেশন, আত্মবিশ্বাস এবং উদ্বিগ্নতা ভাষা অর্জনকে প্রভাবিত করে। দ্বিতীয় ভাষা শেখার ক্ষেত্রে অর্জনকেই (অ্যাকুইজিশন) উৎসাহিত করতে হবে, যা অবচেতনভাবে ভাষা শিক্ষা গ্রহণে উজ্জীবিত করে। তবে এ কথা ভাবার দরকার নেই যে সচেতনভাবে ভাষা শেখার কোনো পথই নেই, কিংবা একেবারেই শেখা যাবে না। যেমন সচেতনভাবে শেখা মানে সঠিকভাবে গ্রামার শেখা, যেটি পরিকল্পিত কোনো বিষয় লিখতে বা বলতে সার্থকভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। দীর্ঘদিন যাবত বিতর্ক চলে এসেছে– গ্রামার ডিডাকটিভলি না ইনডাকটিভলি শেখানো হবে। তবে দুটি পদ্ধতিই ভাষার লার্নিং করা শেখাচ্ছে, অর্জন করা নয়। আবার এ নিয়েও বিতর্ক আছে যে আমরা শিক্ষার্থীদের ভুল সংশোধন করব কী করব না। দ্বিতীয় ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে ভুল সংশোধন না করাই ভালো, তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা নষ্ট হয়, বাধা প্রদান করা হয়।

www.pathagar.com

শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়নে আত্ম-অবলোকন বা সেল্‌ফ-মনিটরিং

একজন পেশাদার শিক্ষক জানতে চান বা জানার ইচ্ছে প্রকাশ করেন যে তিনি কোন ধরনের শিক্ষাদানে কতটা পারদর্শী, কতটা ফলপ্রসূ তার শিক্ষাদান এবং পেশাগত জীবনে তিনি কতটা সফল। একজন শিক্ষক এটি কীভাবে জানতে পারেন? আমরা সাধারণত কর্তৃপক্ষের মতামত বা মূল্যায়ন এবং শিক্ষার্থীদের মতামত ইত্যাদির মাধ্যমে বিষয়টি জেনে থাকি। এগুলো ছাড়া আর একটি শক্তিশালী উৎস বা মাধ্যম হচ্ছে নিজ ক্লাসের পাঠদান পর্যবেক্ষণ। একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নে ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ এবং মনিটরিং উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে, যেটি আমরা সাধারণত করে থাকি না বা করার কোনো প্রবণতাও লক্ষ করা যায় না শিক্ষক সমাজের মাঝে।

ব্যক্তিগত মনিটরিং বা অবলোকন কী?

ব্যক্তিগত মনিটরিং হচ্ছে এক ধরনের কাঠামোগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি। ব্যক্তিগত আচরণের ব্যবস্থাপনা আরও সুন্দর এবং নিজের আচরণের ওপর কীভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা যায় তা ব্যক্তিগত মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। ভাষা শিক্ষার ক্লাসে ব্যক্তিগত মনিটরিং দ্বারা আমরা বুঝি একজন শিক্ষকের পাঠসংক্রান্ত তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা। এই তথ্য সংগ্রহ হতে পারে লিখিত বা ভিডিও বা অডিও আকারে এবং পরিচালিত পাঠদানের ওপর ফিডব্যাক নেওয়ার নিমিত্তে এই তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ব্যক্তিগত মনিটরিং শিক্ষক মূল্যায়নের একটি সম্পূরক পদ্ধতি। অর্থাৎ শিক্ষার্থী, সহকর্মী এবং তত্ত্বাবধায়কের নিকট থেকে ফিডব্যাক নেয়া হবে এবং তার সাথে সেল্‌ফ মনিটরিং এক নতুন মাত্রা যোগ করবে।

আত্ম-অবলোকন কেন?

www.pathagar.com

(১) একজন শিক্ষক যে দীর্ঘকাল শিক্ষকতায় নিয়োজিত থাকেন, সে অনুপাতে তার প্রশিক্ষণ খুব কম হয়। আমরা মনে করি, একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেলেই তার পেশাগত উন্নয়ন ঘটে, তাকে তারপর তেমন আর কিছু করতে হবে না। আসলে শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেশাগত উন্নয়নের শুরু– শেষ নয়। শিক্ষকতা জীবন চলাকালীন পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কী কী করা দরকার তা তার জানতে হবে। তার পঠদান ফলপ্রসূ হচ্ছে কি না, শিক্ষার্থীগণ সন্তুষ্ট কি না– এ বিষয়গুলো একদিন কিংবা একটি বা দুটি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায় না। এটি দীর্ঘমেয়াদি কিংবা পুরো পেশাগত জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

(২) আত্ম-অবলোকন শিক্ষককে তার পাঠদান মূল্যায়নে সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণধর্মী সুযোগ প্রদান করে। শিক্ষক উন্নয়নের ক্ষেত্রে রিফ্লেকশন এবং মূল্যায়ন একটি প্রধান চাবিকাঠি। অবিরত শিক্ষক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে আত্ম-জিজ্ঞাসা এবং বিশ্লেষণধর্মী ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারা। এই মনিটরিং তাদেরকে রুটিনমাফিক ও প্রচলিত পদ্ধতির বাইরে নিয়ে যায়, যেখানে সমালোচনামূলক চিন্তা-ভাবনার দ্বারা পরিচলিত হয় তার শিক্ষা।

(৩) আত্ম-অবলোকন একজন শিক্ষকের কল্পিত দৃষ্টিভঙ্গি এবং বাস্তবতার মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে আনতে সহায়তা করে। একজন শিক্ষক হয়তো আত্মতুষ্টিতে ভুগেন যে তার ক্লাসে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে কার্যাবলি বা অভ্যাস শিক্ষার্থীদের করাচ্ছেন, তিনি তার ক্লাসে ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করছেন এবং তিনি নিজেই নিজকে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন যে তিনি একজন সফল শিক্ষক। বাস্তবে খুব গভীর ও নিগূঢ় দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে, একই ধরনের কিংবা এমন কিছু অ্যাকটিভিটি তিনি করাচ্ছেন, যা শিক্ষার্থীদের তেমন একটা কাজে লাগছে না বা তারা উৎসাহ পাচ্ছে না, কিংবা শ্রেণিকক্ষের কার্যাবলি সব শিক্ষার্থীদের কাজে উদ্বুদ্ধ করতে কিংবা অংশগ্রহণ করাতে পারছে না। এটি সেল্‌ফ মনিটরিংয়ের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

(৪) বাহ্যিক একটি দৃষ্টি এখানে কাজ করছে বলে শিক্ষক বুঝাতে পারেন তার কোন কোন বিষয় বা আচরণ বা কার্যাবলি ক্লাসে কাজে লাগছে এবং কোনগুলো লাগছে না।

www.pathagar.com

সেলফ-মনিটরিংয়ের মাধ্যমে একজন শিক্ষক কী শিখতে পারেন?

শিক্ষাবিদ লাফট কি বলছেন আমরা লক্ষ করি। Luft (1969) categorizes four types of information about teacher behavior that teachers can examine through self-assessment : information concerning the open-self, the secret-self, the blind-self and the undiscovered/hidden self.

একজন শিক্ষকের আচরণ তিনি নিজে জানেন এবং অন্যেরাও জানে, সেটি হচ্ছে উন্মুক্ত দিক বা ওপেন সেলফ। এই দিকটি একজন শিক্ষক অন্যের সাথে আলোচনা করতে পারেন।

গোপন দিক হচ্ছে, সেটি যা শিক্ষক নিজে জানেন কিন্তু অন্যেরা জানে না। যেমন কোন বিষয়ে তাকে পাঠদান করতে হবে সবার সামনে, অনেক অজানা বিষয় এখানে রয়েছে অথচ তিনি তা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারছেন না। ব্যাপারটি তিনি অন্যদের জানাতে চান না, পাছে তারা তাকে অযোগ্য কিংবা নিম্নমানের শিক্ষক মনে করেন।

দ্যা ব্লাউন্ড সেলফ বা অন্ধকার দিক হচ্ছে যে বিষয়গুলো একজন শিক্ষক নিজে বুঝতে পারছেন বা তার অজান্তেই ঘটে যাচ্ছে। অন্যের চোখ তিনি এড়াতে পারছেন না অথচ নিজে বুঝতেও পারছেন না। যেমন কোনো আপত্তিকর বেমানান শব্দ বারবার ক্লাসেই বলে যাচ্ছেন, নিজে বুঝতে পারছেন না।

দ্য হিডেন বা আনডিসকভারড বা লুক্কায়িত দিক : এমন একটি দিক বা বিষয়, যা একজন শিক্ষকের ক্ষেত্রে ঘটে যা শিক্ষক নিজেও জানেন না বা বিদ্যালয়ের অন্যরাও জানেন না বা বুঝতে পারেন না। জীবনব্যাপী তার এই অজানা দিকটি থেকেই যায়। সেলফ-মনিটরিংয়ের মাধ্যমে সেটি আবিষ্কার করা যেতে পারে।

সেলফ-মনিটরিং কীভাবে করা যায়?

প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে এই সেলফ-মনিটরিং করা যায়।

যেমন– (১) ব্যাক্তিগত রিফ্লেকশন/ প্রতিফলন দ্বারা (২) রিপোর্টিংয়ের দ্বারা এবং (৩) পাঠের অডিও ভিডিও রেকর্ডের দ্বারা।

একজন শিক্ষক পাঠদানের সময় কী কী করেছেন, সেগুলো তার ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করবেন। এটি পাঠদান করার পরপরই লিখে ফেলতে হবে। শ্রেণিকক্ষে যা যা ঘটেছে এবং শিক্ষকের ব্যক্তিগত অনুভূতি এবং প্রতিক্রিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে

www.pathagar.com

লিপিবদ্ধ করতে হবে। এক সপ্তাহের কিংবা এক মাসের কোন ক্লাসে একজন শিক্ষক কী করেছেন, শিক্ষার্থীরা ক্লাস কতটা উপভোগ করেছে, শিক্ষক তাদের সাথে কী রকম আচরণ করেছেন, কতগুলো গ্রামার ভুল করেছেন বা লিখেছেন বা বলেছেন ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করা।

সেলফ-রিপোর্টিং : এই পদ্ধতিতে একটি ইনভেনটরি বা চেক লিস্ট ব্যবহার করতে পারেন একজন শিক্ষক। কী ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি একজন শিক্ষক ব্যবহার করেছেন বিশেষ কোন পাঠদানের ক্ষেত্রে কিংবা বিশেষ সময়ের মধ্যে কোনটি কতবার ব্যবহার করা হয়েছে। এই চেকলিস্ট শিক্ষক ব্যক্তিগতভাবে কিংবা গ্রুপেও ব্যবহার করতে পারেন। একজন শিক্ষক প্রতিনিয়ত শ্রেণিকক্ষে কী করেন, তা জানার জন্য একটি নিয়মিত মূল্যায়ন পদ্ধতি। একজন শিক্ষক তার ধারণামোতাবেক শিক্ষাদান এবং বাস্তবে কীভাবে ক্লাস পরিচালনা করেছেন, তার মধ্যে ব্যবধান প্রতিফলিত হয় সেলফ-রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে।

পাঠদান রেকর্ডিং : এটি ডায়েরি এবং রিপোর্টের চেয়ে অধিকতর নির্ভরযোগ্য। তবে এ কথা ঠিক যে ডায়েরি লেখা এবং রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে অনেক গভীরে প্রবেশ করা যায়। তবে মিনিট বাই মিনিট বা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পাঠের বিশ্লেষণ দেখা যায় না রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে যেটি সম্ভব রেকর্ডিংয়ের দ্বারা। শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময় একই সাথে অনেক কিছু ঘটে এবং কিছু কিছু ব্যাপার বা ঘটনা স্মরণ রাখা যায় না ডায়েরি লেখা পর্যন্ত। এ ক্ষেত্রে রেকর্ডিং ভালো কাজ করে। একটি রেকর্ড শ্রেণিকক্ষে ঘটে যাওয়া সবকিছুই ধারণ করে রাখতে পারে, যা ডায়েরি কিংবা রিপোর্টিংয়ের মাধ্যমে সম্ভব নয়। একজন শিক্ষক শিক্ষাদানকালে অর্থাৎ ক্লাসে নিজের অজান্তে অনেক কিছুই করেন, যা ডায়েরি লেখা কিংবা রিপোর্ট লেখায় প্রতিফলিত হয় না, ফলে সংশোধন করার সুযোগও পান না। রেকর্ডিং এ ক্ষেত্রে বেশ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। আর তাই McLaughlin (1985:155-6) বলেন, Recording cites a striking example of how a teacher discovered information about her blind and hidden selves through examining a video of her class.

একজন সফল শিক্ষক ডায়েরি লেখা, রিপোর্টিং ও রেকর্ডিং পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে সেলফ-মনিটরিং চালিয়ে যেতে পারেন। অবিরত শিক্ষক উন্নয়নের এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদ্ধতি। একজন শিক্ষকের অজানা বিষয়গুলো শনাক্ত করা এবং সংশোধন করার ক্ষেত্রে সেলফ-মনিটরিং নিঃসন্দেহে একটি কার্যকরী পদ্ধতি।

www.pathagar.com

শিক্ষকতা পেশা– বোরিং না আনন্দময়?

উদীয়মান একদল মানবশিশু বা তরুণদের জীবন, জগৎ এবং বিশ্বের বিবিধ রহস্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য নিয়োজিত যে একদল কর্মীবাহিনী তারাই শিক্ষক নামে পরিচিত। এ পেশার সাথে যারা জড়িত, স্বভাবতই তারা অন্য পেশাজীবীদের চেয়ে একটু আলাদা। এ পেশায় যারা পূর্বে নিয়োজিত ছিলেন, তারা সাধারণত ভোগ-বিলাস ও লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে ছিলেন। পৃথিবী পাল্টেছে, শিক্ষকতা পেশাও পাল্টেছে। পরিবর্তন এসেছে এ পেশায় নিয়োজিতদের। বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান এখন আর শিক্ষকদের মধ্যে তেমন একটা চোখে পড়ে না। এখন তারা সময়ানুবর্তী অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ের বেশি সময় শিক্ষাদান করেন না। তারা ঘড়ি ধরে ৫৯ মিনিট পড়ান। এক মিনিটের মধ্যে অন্য আরেকটি ব্যাচকে ঢোকার সুযোগ দেন। শিক্ষকদের শহরে ভালোমানের বাড়ি আছে। অনেক শিক্ষক গর্ব করেই বলেন, বাসা নয় স্বর্গ বানিয়েছি। তার বা তাদের এই স্বর্গ বানানোর অর্থ ঘুষের টাকার থেকে আসেনি, এসেছে প্রাইভেট পড়ানো টাকা থেকে। এগুলো সবই পরিবর্তন। তবে এগুলো সবই পজিটিভ পরিবর্তন নয়। আমি যে পরিবর্তনের কথা বলতে যাচ্ছি সেটি হচ্ছে শিক্ষাদান পদ্ধতির পরিবর্তন। এই পরিবর্তন আমাদের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না।

এখন শিক্ষাদান পদ্ধতি হচ্ছে অংশগ্রহণমূলক। অর্থাৎ শিক্ষাদান পদ্ধতিতে সবাই শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে। পূর্বে ধারণা ছিল শিক্ষক শুধু শিক্ষাদান করবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা তা শুধু শুনবে। কিন্তু এই একমুখী শিক্ষাদান আর শ্রবণ করা ছাত্র-ছাত্রীদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে না। এতে তারা খুব কমই উপকৃত হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, যে শ্রেণিতে শুধু শিক্ষক নিজে কথা বলছেন ও লেকচার দিচ্ছেন এবং শিক্ষার্থীরা শুধু শ্রবণ করছে, সে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা ৩০ ভাগ উপকৃত হয়। আর যে ক্লাসে শিক্ষার্থীরা তাদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক

www.pathagar.com

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যবহার করছে, তারা ঐ ধরনের ক্লাস থেকে শতকরা ৭০-৮০ ভাগ উপকৃত হয়। এখন আধুনিক শিক্ষক হচ্ছেন তিনি, যিনি তার শিক্ষার্থীদের শিক্ষাগ্রহণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করাতে পারেন। কীভাবে অংশগ্রহণ করাবেন তার কতকগুলো পদ্ধতি আছে। যেমন - দলগত কাজ, জুটিতে কাজ ইত্যাদি।

আমি অনেক শিক্ষকদের ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রশ্ন করেছি, আপনি শিক্ষকতা পেশায় কতটা সন্তুষ্ট বা এ পেশা কতটা উপভোগ করছেন? ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই বলেছেন, বোরিং পেশা। ঘণ্টা পড়ার সাথে সাথে একজন শিক্ষক মানসিক কিংবা শারীরিকভাবে প্রস্তুত থাকুক বা না থাকুক, ডিস্টারবড থাকুক, ক্লাসে তাকে ঢুকতেই হচ্ছে। আর ক্লাসে ঢুকে তাকে চুপচাপ বসে থাকলে চলবে না। ক্লাসের সাইজ (সংখ্যানুপাতে) ছোট হলে এক ধরনের ম্যানেজ করা যায়, কিন্তু ক্লাস সাইজ বড় হলে শিক্ষক এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক চাপে ভোগেন। কারণ ৫০-৬০ কিংবা তারও বেশি শিক্ষার্থী একটি ক্লাসে থাকে আর প্রায় সবাই এক এক ধরনের চরিত্রের অধিকারী। তারা তাদের স্বভাবসুলভ আচরণ করবে ক্লাসে, যদি তাদেরকে ভীষণভাবে ব্যস্ত না রাখা যায়। তা না হলে কেউ চেঁচামেচি, কেউ চিৎকার, কেউ খোঁচাখুঁচি করবে। আর শিক্ষক যদি চুপচাপ থাকেন, তা হলে তো কথাই নেই। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা ক্লাসে কখনই বিনা কাজে চুপচাপ বসে থাকবে না। তাদের বয়স, প্রয়োজন, চাহিদা, সিলেবাস ও পরীক্ষা মোতাবেক কোনো কাজে ব্যস্ত না রাখলে তারা মজা পাবে না, তাই এসব দিকে খেয়াল রেখে একজন শিক্ষককে প্রস্তুতি নিয়ে ক্লাসে ঢুকতে হয়। কিন্তু তিনি যদি মানসিক, ব্যক্তিগত, পারিবারিক কিংবা শারীরিক কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকেন, তা হলে প্রস্তুতিও নিতে পারেন না এবং ক্লাসে তার প্রতিফলন ঘটবে। শিক্ষার্থীদের স্বভাবসুলভ ও বয়সী আচরণ তাকে আরও মানসিকভাবে পর্যুদস্ত করবে। বাস্তবে একজন শিক্ষককে প্রতিদিন এ ধরনের একটি কিংবা দুটি ক্লাস যদি করতে হয়, তা হলে তিনি হয়তো কোন রকম ম্যানেজ করতে পারেন। কিন্তু একজন শিক্ষককে এ ধরনের চার, পাঁচ কিংবা ছয়টি ক্লাস নিতে হয়। ফলে তার মানসিকতা স্বভাবতই বিষানো থাকে আর তাই অনেকেই বলেন যে এটি একটি বোরিং বা বিরক্তিকর পেশা। তাই যাদের সুযোগ আছে তারা অন্যত্র চাকরি খুঁজতে থাকেন।

তা ছাড়া একজন শিক্ষকের কাজ তো শুধু ক্লাসেই নয়, টিউটরিয়েল পরীক্ষা নেওয়া, খাতা পরীক্ষণ করা, প্রশ্নপত্র তৈরি করা, পরীক্ষার ডিউটি করা ইত্যাদিসহ অনেক ধরনের কাজ একজন শিক্ষককে করতে হয়। আর এসব কারণে একজন শিক্ষক ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় ভালোভাবে ক্লাসের প্রস্তুতি নিতে পারেন না। নতুন কিছু জানার ও শেখার আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তিনি হয়তো অনেক সময়

www.pathagar.com

তা পেরে ওঠেন না। আর প্রতিষ্ঠানটি যদি হয় বেসরকারি এবং অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া, তা হলে তো কথাই নেই। চাকরি শেষে তার কোনো আর্থিক নিরাপত্তা নেই, এই চিন্তা তাকে জ্বালাতন তো করবেই। তিনি জাতিকে শিক্ষিত করার মহান ব্রতে নিয়োজিত অথচ তার নিজের সন্তানকে সঠিকভাবে পরিচালিত করার অর্থ যখন তার থাকে না, তখন কি তিনি এই মহান কাজে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করতে পারেন? পারার কথা নয়, কারণ তিনি তো একজন মানুষ, তার রয়েছে সব ধরনেরই চাহিদা, যা একজন সাধারণ মানুষের থাকে। আর তাই তিনি অনেক সময় ইচ্ছের বিরুদ্ধে প্রাইভেট কোচিং বা এ ধরনের উপার্জনের দিকে ঝুঁকে পড়েন।

তা হলে এর সমাধান কী? সমস্যা তো জটিল এবং ব্যাপক। সমস্যা ব্যক্তিগত, প্রতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত। আপনি ব্যক্তিগত, প্রাতিষ্ঠানিক এবং বেশি ঝুঁকি নিলে হয়তো সামাজিক পর্যায় পর্যন্ত সমস্যার কিছু সমাধান দিতে পারেন, কিন্তু রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তো আপনার তেমন কিছু করার নেই। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর একই ধরনের কাজ, ক্লাস, বিদ্যালয় নিতান্তই একঘেয়েমি। যত একঘেয়েমিই হোক, কাউকে না কাউকে তো এই মহান ব্রত ও দায়িত্ব পালন করতেই হবে আমাদের এই দরিদ্র দেশে। একদল নিঃস্বার্থ মানুষদের তো এগিয়ে আসতে হবে জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করতে। তাই হাজার সমস্যা আছে এই পেশায়, তারপরেও অনেক শিক্ষক এখানে চাকরি করেন, নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেন এই মহান পেশায়। বিনিময়ে জীবনব্যাপী দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করেন, আপস করেন না কোনো মিথ্যের সাথে, অসত্যের সাথে। সমাজ তাকে এভাবেই চেনে, জানে, মনে করে তার মৃত্যুর পরেও। এই তার চরম পাওয়া, জীবন তার সার্থক।

কেউ কেউ আবার শিক্ষকতা পেশা ছেড়ে দিয়ে ব্যাংকিং পেশায় চলে আসেন। শুধু অর্থনৈতিক নিরাপত্তার জন্য? না, শুধু তাই নয়। ব্যাংকিং পেশার চাপ তারা সহ্য করতে রাজি কিন্তু শিক্ষকতার শারীরিক, মানসিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপ সহ্য করতে পারছেন না। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকতা পেশায় ওপরে ওঠার তেমন কোনো ধাপ নেই, খুব সীমিত ধাপ। এটিও বোরিং হওয়ার আরেকটি কারণ।

একজন শিক্ষককে প্রতিদিন ৪ থেকে ৫টি ক্লাস নিতে হয়। পুরো সময়ই যদি তিনি কথা বলেন, তা হলে ক্লান্ত হয়ে যাবেন। তাই শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কাজে লাগাবেন, আর তাই আপনাকে 'টিচার টকিং টাইম' কমাতে হবে বাড়াতে হবে 'স্টুডেন্ট টকিং টাইম'। শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করাতে পারলে তারা ক্লাসে মজা পাবে,

www.pathagar.com

আপনার চাপ কমবে। শারীরিক ও মানসিকভাবে আপনি সুস্থ থাকবেন। নতুনভাবে চিন্তা করুন কীভাবে ক্লাসকে আপনার ও শিক্ষার্থীদের জন্য আনন্দময় করা যায়। স্কুল আপনার আনন্দের জায়গা, খেলার জায়গা, উপার্জনের জায়গা এবং বিনোদনের জায়গা। এ কথা মনে করুন সব সময়।

বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করুন আপনার বিদ্যালয়ে। যেমন : গণিত মেলা, গণিত অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞান মেলা ও অলিম্পিয়াড, ইংরেজি সপ্তাহ বা মেলা, কুইজ কম্পিটিশন ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করুন, আপনার প্রশাসনিক, পেশাগত ও সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, আনন্দ পাবেন কাজে।

দেশে বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষক সমিতি, পেশাগত সমিতিগুলোর সদস্য হোন। সেখানকার পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করুন, দুনিয়াব্যাপী না হলেও দেশব্যাপী শিক্ষকদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করুন। একে অপরের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার কথা, পেশাগত উন্নয়নের কথা, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা ভাগাভাগি করুন, দেখবেন অনেক আনন্দ পাবেন। আলাদা এক জগৎ সৃষ্টি হবে, সেখান থেকে আরও বেশি আনন্দ পাওয়ার চেষ্টা করুন।

www.pathagar.com

ফিডব্যাক

ফিডব্যাক কেন?

একজন মানুষ কখনও পুরোপুরি পারফেক্ট হতে পারে না একমাত্র স্রষ্টা যাদের বিশেষভাবে তৈরি করেছেন তারা ব্যতীত। আর একটি কথা হচ্ছে সুন্দরের কোনো সীমা নেই, ভালোর কোনো সীমা নেই। আমরা যে যেভাবে ক্লাস পরিচালনা করি তার মধ্যে অবশ্যই অনেক বিষয় থাকে, সেগুলো আরও ভালো করার বা উন্নত করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে, শিক্ষার্থী আরও সহজে, আরও আনন্দের সাথে বিষয়টি বুঝতে এবং করতে পারে। কিন্তু সেই বিষয়টি আমরা কেউ কখনও ভেবেও দেখি না এবং মনে করি আমি যেভাবে করেছি, এটিই সর্বোত্তম পন্থা বা সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। ব্যাপারটি কি আসলেই তাই?

আমাদের দেশে শিক্ষকগণ ক্লাসে ঢোকার পর তাকে দেখার আর কেউ নেই। তিনিই সর্বেসর্বা। তিনি যা পড়ান বা যেভাবে পড়ান, সেটি সঠিক বা বেঠিক বা শিক্ষার্থীদের ভালো লাগুক বা না লাগুক, আনন্দময় কিংবা বিরক্তিকর যাই হোক না কেন, তাকে বলার বা ফিডব্যাক দেয়ার কেউ নেই। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ব্যাপারটি কখনও নিজেরা বলবে না। তারা যেটি করবে যে শিক্ষকের ক্লাস ভালো লাগবে না সম্ভব হলে তার ক্লাসে উপস্থিত না হওয়া। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ, স্কুল কর্তৃপক্ষ, সহকর্মী কেউ আমাদের ক্লাস অবজারভ করে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়ার বিধান আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেভাবে নেই। ইদানীং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কিছুটা শিক্ষকদের অবহিত করা হচ্ছে, কিন্তু সেটুকুই কি সব?

কার্যকরী ফিডব্যাক নেয়ার কয়েকটি নিয়ম

১। মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন, শ্রবণ করার সময় উত্তর তৈরি করা কিংবা প্রতিরোধ করার চেয়ে ধৈর্যের সাথে শ্রবণ করুন। কোনো বিষয় যখন আমাদের

www.pathagar.com

জানা থাকে বা কমন পড়ে বা কিছুই বুঝি না, তখন আমরা সাধারণত উত্তেজিত হয়ে পড়ি। শ্রবণ করা বন্ধ করে দেই নয়তোবা উসখুস করি নয়তো বা অন্যের শ্রবণ করায় বিরক্তি প্রকাশ করি।

২। তৎক্ষণাৎ আক্রমণাত্মক বা প্রতিবাদী হবেন না, যদি হন তাহলে আপনাকে আসলে কি বলা হচ্ছে তা অপানি শুনতে পারবেন না। এটি অপনার সার্বিক পেশাগত কর্মের ও দক্ষতার বিচার নয়, আলোচনাটি হচ্ছে অপনাকে একজন পর্যবেক্ষণ করেছেন। তার মতো, সেই বিষয়ের আলোচনা মাত্র।

৩। কোনো পয়েন্ট/বিশেষ কিছু স্পষ্ট শুনতে না পেলে বা বুঝতে না পারলে পুনরায় বলতে অনুরোধ করুন। পরীক্ষা করুন কী বলা হয়েছে, প্রয়োজন হলে আবারও বলতে বলুন এবং ব্যাখ্যা চাইতে কার্পণ্য করবেন না বা ভয় পাবেন না।

৪। উদাহরণ দিতে বলুন। মনে রাখবেন, পর্যবেক্ষণের সকল বিচার বা বিষয় প্রমাণনির্ভর, অনুমান-নির্ভর নয়। ধরে নিন /মনে করুন পর্যবেক্ষক যা বলছেন তা গঠনমূলক, অন্যকিছু প্রমাণ করার চেষ্টা না হলে। তারপর বিবেচনা করুন এবং ব্যবহার করুন গঠনমূলক বিষয়গুলো।

৬। আপনি উত্তর দেওয়ার পূর্বে থামুন, চিন্তা করুন এবং ভাবুন।

৭। সহজভাবে গ্রহণ করুন পর্যবেক্ষকের বিবেচনা এবং বক্তব্য আত্মরক্ষার জন্য সেগুলো বাদ দেওয়ার চিন্তা থেকে। পর্যবেক্ষণের ফলাফল এবং ফিডব্যাক উন্নয়নের সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করুন এবং ব্যবহার করুন। মনে রাখবেন, গঠনমূলক, চিহ্নিতকৃত ফিডব্যাক পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের সবচেয়ে নিশ্চিততর এবং দ্রুততম পদ্ধতিগুলোর মধ্যে একটি।

৮। আপনি পর্যবেক্ষকের কাছে পরামর্শ চান কীভাবে আপনি আপনার ক্লাসকে আরও মার্জিত, ফলপ্রসূ ও আকর্ষণীয় করতে পারেন। কীভাবে আপনি আপনার আচরণে পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারেন।

৯। যিনি আপনাকে ফিডব্যাক দিলেন, তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করুন এবং ধন্যবাদ দিন। মনে রাখবেন, সবাই ফিডব্যাক দিতে পারেন। কেউ বিষয়ের ওপর, কেউ আচরণের ওপর, কেউ ভাষা ব্যবহারের ওপর, কেউ মেজাজের ওপর ইত্যাদি সবকিছুই শিক্ষাদানের সাথে জড়িত, অতএব সবার ফিডব্যাক আপনি মনোযোগ দিয়ে শ্রবণ করুন এবং সে অনুযায়ী আগান।

ফিডব্যাক দেওয়া কিংবা নেওয়ার সময় দৃষ্টিভঙ্গি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে স্বশাসন বা স্বনিয়ন্ত্রণ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মানুষ জন্মগ্রহণ করে স্বাধীনতা ভোগ করার নিমিত্তে। শিশুকে খাওয়ানোর সময় সে হাত দিয়ে চামচ ধরতে চায় এবং নিজে খেতে চায়, হাঁটার জন্য নিজে পা বাড়ায়, বড় হলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য কাজ/ চাকরি খোঁজে। এগুলো সবই স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রচেষ্টাসমূহ। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে এই জন্মগত স্বাধীনতার প্রবৃত্তি শিশু স্কুলে অনুসরণ করতে পারে না। শিশু শিক্ষার্থীরা সব সময়ই খুব বেশি উত্তেজিত থাকে এবং বিমোহিত হয় নতুন কিছু জানার জন্য এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য। কিন্তু তাদের নিয়মানুবর্তী করার প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে তাদের সৃষ্টিশীল প্রতিভা বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় এবং শিক্ষার্থী তার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রতিটি মুহূর্তেই আমরা জ্ঞান অর্জন করি বা করার বৃত্তের মধ্যে অবস্থান করি। ক্রিটিক্যাল পেডাগজি বলছে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছেও শেখে, শিক্ষার্থী শিক্ষকের কাছ থেকে শিখে। অতএব, পেডাগজি শুধু শিক্ষক কিংবা শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক হবে না, হবে শিক্ষাকেন্দ্রিক। শিখন পরিবেশ সৃষ্টিশীল হয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আদান-প্রদানের মাধ্যমে। এভাবে বলা যায়, কেউই পূর্ণ শিক্ষিত নয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের ব্যক্তিগত চাহিদা অনুযায়ী পূর্ব অভিজ্ঞতা ও বিশ্বাস অনুযায়ী শিখতে পারে এবং জীবনের বাস্তবতার জন্য নতুন পথের সন্ধান পেতে পারে।

এভাবে শিক্ষার স্বাধীনতা ক্রিটিক্যাল পেডাগজির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থী যদি জ্ঞানের উৎস ধরা হয়, তা হলে তাকে স্বাধীন হতে হবে এবং তখনই সে নিজের অভিজ্ঞতাগুলোকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে যাবে।

www.pathagar.com

শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষার দায়িত্ব নিজেরা গ্রহণ করবে এবং জ্ঞানলাভের অন্যান্য উৎসের ওপরও নির্ভরশীল হবে। যেসব শিক্ষার্থীরা প্রকৃতিগতভাবেই মোটিভেটেড এবং মেধাবী, তারাই ক্লাসের বাইরে অধিকাংশ কার্যাবলি গ্রহণ করতে রাজি হয়, অন্যরা হয় না। তবে প্রকৃত মোটিভেটেড শিক্ষার্থীরা যারা শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে নিজেরা কাজ করবে, তাদের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ শিক্ষার্থী যারা নিজেরা কিংবা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে কোনো কাজ করবে না, তারা তাহলে কতটা স্বাধীনতা ভোগ করবে? নাকি তারা পুরোটাই শিক্ষকদের এবং প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে?

বিভিন্ন উদ্দেশ্যে পড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কিংবা সাধারণভাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য অত্যাবশ্যক। শিক্ষার্থীর সামাজিক এবং আবেগীয় উন্নয়নের জন্য পড়ার ভূমিকা অনেক। শিক্ষার্থীরা যদি বিভিন্ন ধরনের পড়ার বিষয় বা ম্যাটেরিয়ালস না পড়ে, তাহলে তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দক্ষতা হারাবে। পড়ার মাধ্যমে তারা তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে পারে। পড়া বিভিন্ন বিষয় যেমন গণিত, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য এবং ভূগোল সম্পর্কে জানার দ্বার উন্মোচন করে। এভাবে পড়ুয়ারা এসব বিষয়ে সহজেই সাফল্য অর্জন করতে পারে। গবেষণায় দেখা গেছে, ছোট সময় থেকেই পড়ার অভ্যাস মানুষকে অনেক বেশি পজিটিভ বিষয় দান করে, তাই ছোট সময় থেকেই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে, আর এ বিষয়টি খেয়াল রাখবেন অভিভাবক ও শিক্ষকগণ।

একজন শিক্ষক যত ভালোই হোক, শিক্ষার্থীরা কখনই ভাষা শিখবে না/ অন্য কোনো বিষয় শিখবে না, যদি না শিক্ষার্থীরা ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরে শেখার প্রস্তুতি না নেয়/শেখার উদ্দেশ্য না থাকে। এর কারণ হচ্ছে ভাষা শেখা একটি জটিল কাজ এবং বিভিন্নমাত্রিক; এজন্য শিক্ষার্থীদের বেশ সময় ব্যয় করতে হয়। ডেভিড নুন্যান (David Nonan) বলেছেন, "ক্লাসে সবকিছু শেখানো যায় না।" যদি যায়ও তারপরেও বিষয়টি খেয়াল রাখা দরকার যে একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর পাশে থাকে না, যখন শিক্ষার্থী বাস্তব জীবনে ভাষা ব্যবহার করে।

ক্লাসের কম সময় পুষিয়ে নেওয়ার জন্য এবং নিষ্ক্রিয়তা, যা সত্যিকার শেখার ক্ষেত্রে শত্রু তার প্রতিরোধ (কাউন্টার) করার জন্য শিক্ষার্থীর নিজের ভাষা উন্নয়নের জন্য শিক্ষার্থীদের যতটা সম্ভব স্বাধীন শিক্ষার্থী হতে হবে। তবে সব সময় একাকী/ নিজ থেকে এ ব্যাপারটি হয়ে ওঠে না। শিক্ষা-সংস্কৃতির দ্বারা এটি নিয়ন্ত্রিত হয় যে সংস্কৃতিতে শিক্ষার্থী ভাষা শেখে।

www.pathagar.com

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ক্লাসে স্বাধীনতা দিতে পারেন রিফ্লেকশন/প্রতিফলনের মাধ্যমে। শিক্ষার্থীরা কী শিখেছে তার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের অ্যাক্টিভিটি করাতে পারেন ক্লাসে, যেখানে শিক্ষার্থীরা নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে। রিফ্লেকশন শিক্ষার্থীর ভালো ও দুর্বল দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করতে সহায়তা করে। ভাষা শেখার ক্ষেত্রে স্পিকিং বা লিসেনিং কঠিন কেন?

এক সপ্তাহ কিংবা দুই সপ্তাহ পরে বিশেষ কোনো লেসনের ওপর শিক্ষার্থীদের মতামত নেয়া যেতে পারে, যেখানে শিক্ষার্থীরা স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে।

হোমওয়ার্ক : ক্লাসের বাইরে বাসার কাজই শিক্ষার্থীর নিজের স্বাধীনতা প্রয়োগ করার শক্তিশালী পথ। এখানে শিক্ষকের সাহায্য ছাড়া শিক্ষার্থী কাজ করে। তবে শিক্ষককে নির্দিষ্ট করে দিতে হয়। কতটুকু হোমওয়ার্ক শিক্ষার্থী বাসায় করবে। শিক্ষককে খেয়াল রাখতে হবে একজন শিক্ষার্থীকে শুধু একটি বিষয় অধ্যয়ন করতে হয় না, একাধিক বিষয়। হোমওয়ার্ক শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে গিয়ে যেন বোঝা না হয়, তাহলে তারা ক্লাসে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে।

বাড়ির কাজকে 'লার্নার অটোনমির' চেয়ে প্রয়োজনীয় বোঝা এবং ঝামেলা হিসবে দেখা হয়। শিক্ষার্থীর হোমওয়ার্ক যাতে বিরক্তিকর না হয়। তবে হোমওয়ার্ক যদি প্রাসঙ্গিক হয়, তা হলে তা শিক্ষার্থীরা কিছুটা আনন্দ নিয়ে করবে।

অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ডায়েরি বা জার্নাল লিখতে বলেন, যাতে শিক্ষার্থীরা রিফ্লেক্ট করতে পারে তাদের সাফল্য, কঠিনত্ব। এখানে শিক্ষার্থী যা শিখেছে সে সম্পর্কে লিখতে পারে আবার সম্পূর্ণ নতুন বিষয়ও লিখতে পারে।

গ্রুপ/জুটিতে কাজও শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র তৈরি করে।

একজন শিক্ষার্থী যদি দেখে বা বুঝে যে তাকে যে কাজটি দেয়া হয়েছে সেটি তার জন্য খুবই সহজ কিংবা তার সীমার একেবারেই বাইরে অর্থাৎ বেশ কঠিন, তবে সে ব্যাপারটি তাকে সবচেয়ে বেশি ডিমুটিভেটেড করবে।

www.pathagar.com

কীভাবে বাড়াবেন আপনার Vocabulary এবং একজন শিক্ষক কীভাবে শেখাবেন

কীভাবে বাড়াবেন আপনার Vocabulary? ভাষা ব্যবহার করার ক্ষেত্রে Vocabulary–এর ব্যবহার এবং বাড়ানোর মধ্যে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। আপনি যদি শব্দই না জানেন, তাহলে ভাষা ব্যবহার করবেন কীভাবে? ভাবের আদান-প্রদান বা কমিউনিকেশন করবেন কীভাবে? আজকে আমরা আলোচনা করব কীভাবে আমরা Vocabulary বৃদ্ধি করব এবং একজন শিক্ষক ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের Vocabulary কীভাবে শেখাবেন। Vocabulary মানে আমরা বুঝি অনেকগুলো শব্দ জানা। আসলে Vocabulary মানে শুধু শব্দ জানা নয়, বাক্যে শব্দের সঠিক ব্যবহার। অনেক শিক্ষক কিংবা অনেক অভিভাবক ছাত্রছাত্রীদের বলেন dictionary মুখস্থ করে ফেলতে। শুধু dictionary মুখস্থ করে ফেললে যে জ্ঞান অর্জিত হবে তা দিয়ে সঠিকভাবে ভাষা ব্যবহার করা যায় না। অতএব Vocabulary বৃদ্ধির সঠিক কতকগুলো কৌশল এখানে উল্লেখ করা হলো।

মনে রাখবেন, আপনি যেসব শব্দের শুধু অর্থ জানেন কিন্তু শব্দগুলো ব্যবহার করেন না, এই বিষয়টি passive vocabulary নামে পরিচিত, আর যে শব্দের আপনি অর্থও জানেন এবং ব্যবহারও জানেন, সে বিষয়টি active vocabulary নামে পরিচিত। আর আপনার দরকার active vocabulary, কারণ active vocabulary -এর মাধ্যমেই আপনি communicate করবেন আপনার বাস্তব জীবনে প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানোর জন্য।

ধরা যাক, একজন শিক্ষক স্কুল সম্পর্কিত অনেক শব্দ ছাত্র-ছাত্রীদের শেখাবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রুপ করে দিতে পারেন। প্রতিটি গ্রুপকে বলবেন যে গ্রুপ যত বেশি ইংরেজি শব্দ দশ বা পনের মিনিটে লিখতে পারবে, সে গ্রুপ বিজয়ী হবে। এতে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে এবং তারা দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে কাজটি করবে। ছাত্র-ছাত্রীদের brain অত্যন্ত শার্প, বয়সের কারণে তারা এক কিংবা দু মিনিট কোনো ধরনের কাজ ছাড়া বসে থাকতে পারে না। শিক্ষক যদি তাদেরকে এ ধরনের সৃজনশীল কোনো কাজে না লাগান তাহলে দেখা যাবে তারা অন্য কোনো কাজ করে সময় নষ্ট করছে। দশ মিনিট

www.pathagar.com

পড়ে শিক্ষক তাদের খাতাগুলো সংগ্রহ করবেন। এরপর প্রতি গ্রুপ থেকে একজন করে প্রতিনিধি এসে তার গ্রুপের লিখিত শব্দগুলো পুরো ক্লাসকে পড়ে শোনাবে। এভাবে দেখা যাবে তিনটি বা চারটি গ্রুপের শব্দগুলোর মধ্যে অনেক common এবং কিছু uncommon শব্দ পাওয়া যাবে। uncommon শব্দগুলো সকল ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নতুন করে জানা হলো। এমন কিছু শব্দ যেগুলো কোনো শিক্ষার্থীই লিখতে পারেনি, সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষক নিজে লিখে দিবেন বোর্ডে এবং বলে দিবেন।

এবার শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উক্ত শব্দগুলো দিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলবেন। এ কাজটিও একইভাবে গ্রুপে তৈরি করতে বলতে পারেন। নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করে দেবেন। একইভাবে শিক্ষক সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীর খাতা সংগ্রহ করবেন এবং দ্বিতীয় অন্য একজনকে আহ্বান করবেন উপস্থাপনা করার জন্য। দেখা যাবে অনেক ছাত্র-ছাত্রীই ভুল বাক্য লিখবে, শিক্ষকের কাজ হবে ধমক না দিয়ে এবং নাম উল্লেখ না করে বাক্যগুলো শুদ্ধ করে দেয়া। শিক্ষক বলবেন বাক্যটি এভাবে লিখলে ভালো হবে। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে শুদ্ধ বাক্যটি/বাক্যগুলো পুনরায় লিখতে বলবেন। তাহলে দেখা যাবে ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল সম্পর্কিত paragraph বা essay আলাদভাবে মুখস্থ করতে হচ্ছে না। আর Vocabulary টিচিংয়ের এখানেই সার্থকতা। এভাবে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে একজন শিক্ষক কিংবা সমবয়সী বন্ধুবান্ধব বা ভাই বোন কিংবা আত্মীয়স্বজন মিলে এই অভ্যাস করে vocabulary বাড়াতে পারেন।

ক্লাসে গ্রুপে এ ধরনের কাজ করার কতকগুলো উদ্দেশ্য আছে। প্রথমত, এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ একটি অবশ্যম্ভাবী/অপরিহার্য বিষয়, যা অনেক শিক্ষকই খেয়াল করেন না। দুর্বল শিক্ষার্থী যারা সাধারণত কোনো ধরনের কাজে অংশগ্রহণ করে না, গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষক যদি তাদের কাজে ব্যস্ত না রাখতে পারেন, তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা ক্লাসে আসার আগ্রহ হারিয়ে ফেলবে। শিক্ষক যদি সব সময় ক্লাসে কথা বলেন এবং ছাত্র-ছাত্রী যদি শুধু তাদের কথা শোনে তাহলে শিখন-শিক্ষণ পদ্ধতি আনন্দময় হয়ে ওঠে না।

Vocabulary শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক নিচের Spider Gram পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারেন। শিক্ষক বোর্ডে School শব্দটি লিখবেন। এবার ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে Elicitation-এর মাধ্যমে School সম্পর্কিত কথাগুলো বের করে নিয়ে আসবেন এবং বোর্ড লিখবেন। এত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হবে এবং পুরো ক্লাস সক্রিয় থাকবে।

www.pathagar.com

এ ছাড়াও শিক্ষক cat কথাটি বোর্ডে লিখবেন। এবার তিনটি অক্ষর দিয়ে পৃথক পৃথকভাবে একটি noun, একটি verb, একটি adjective শব্দ তৈরি করতে বলবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষক সরাসরি শিক্ষার্থীদের সাহায্য করবেন।

আর একটি পদ্ধতি আছে, যাকে বলে Antakshari চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক এই অভ্যাসটি করাতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীরা দুই দলে বিভক্ত হয়ে যাবে অথবা যার যার সিটে বসে থাকবে। ধরা যাক, একজন শিক্ষার্থী sell শব্দটি উচ্চারণ করল। এই শব্দটির শেষ অক্ষর l, L দ্বারা অন্য আর একজন শিক্ষার্থী নতুন আর একটি শব্দ বানাবে। এভাবে দেখা যাবে সমস্ত শিক্ষার্থী এই প্রাকটিসে অংশগ্রহণ করছে এবং ক্লাস হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। শিক্ষকও ক্লাসে আনন্দ পাবেন তাকে আর অধৈর্য হয়ে ক্লাসে বসে থাকা বা ক্লাস কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন এ ব্যাপার নিয়ে চিন্তা করতে হবে না।

ছাত্র-ছাত্রী কিংবা যে কেউই ইংরেজি Vocabulary বৃদ্ধি করার জন্য বাসায় কিংবা বন্ধুবান্ধবদের মধ্যেও এ ধরনের অভ্যাসগুলো করতে পারেন। বড়ভাই, বোন, বাবা অথবা মা কিংবা বন্ধুদের মধ্যে একজন শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করতে পারেন। কোনো অবসর সময়ে এ ধরনের অভ্যাস করতে পারেন। অযথা সময় নষ্ট না করে নিজেরা এ ধরনের অভ্যাস করতে পারেন, তাহলে একদিকে আপনার Vocabulary উন্নত হবে, সময়টি ভালোভাবে কেটে যাবে এবং আপনার কথা বলার সাহস ও দক্ষতা বেড়ে যাবে।

Vocabulary শেখানোর নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো শিক্ষক বা অভিভাবক ব্যবহার করতে পারেন।

১। সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেয়া বা করা (Definition / Explanation): ইংরেজিতে এমন কিছু শব্দ আছে, যেগুলোর অর্থ বোঝানোর জন্য বা বুঝার জন্য শিক্ষককে Definition/Explanation দিতে হবে এবং শিক্ষর্থীকে অক্সফোর্ড ডিকশনারি থেকে Definition/ Explanation পড়তে হবে। মনে রাখতে হবে, ইংরেজি শেখার জন্য অবশ্যই ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি ব্যবহার করতে হবে, কারণ সেখানে শব্দের সঠিক ব্যাখ্যা এবং বাক্য তৈরি করে উক্ত শব্দের ব্যবহার দেখানো হয়েছে। একটি শব্দের শুধু বাংলা অর্থ জানলেই হবে না আর সব সময় সব শব্দের সঠিক বাংলা করাও যায় না, ফলে ভাষাগত একটি ব্যবধান থেকে যায়। এজন্য ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থীদের। শিক্ষকদের তো বটেই।

www.pathagar.com

২। অনুবাদ (Translation): আবার কিছু কিছু শব্দ আছে যেগুলো অনুবাদের মাধ্যমে সহজেই বোঝানো যায় এবং বুঝা যায়। এক্ষেত্রে ইংলিশ টু বেঙ্গলি ডিকশনারি ব্যবহার করা যেতে পারে ব্যক্তিগতভাবে শেখার ক্ষেত্রে এবং শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক অনুবাদ করে দিতে পারেন। তবে সব সময় ইংলিশ টু ইংলিশ ডিকশনারি ব্যবহার করাই ভালো।

৩। বাস্তব চিত্র/চার্ট/ছবি প্রদর্শন (Realia-Using real objects/ showing chart/ pictures) : Vocabulary শেখানোর ক্ষেত্রে এটি সবচেয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ। কারণ visualization-এর মাধ্যমে যে শিক্ষা অর্জন করা হয় তা দীর্ঘস্থায়ী। যেমন আমরা তিন ঘণ্টা একটি সিনেমা দেখে তার পুরো ঘটনা অনেক দিন মনে রাখতে পারি তার কারণ আমরা ঘটনাটি visualize করেছি। অথচ একটি নভেল পড়ে আমরা ঘটনা অতটা মনে রাখতে বা ধরে রাখতে পারি না। কাজেই যতগুলো সম্ভব আমরা ছবি বা বাস্তব বস্তু বা চার্টের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদেরকে Vocabulary শেখাব এবং শিখব।

৪। মুখমণ্ডলের প্রকাশ/ভাবভঙ্গি (Facial expression/Gestures): কিছুকিছু শব্দ যেমন– anger, somber, grave, gravity, ইত্যাদি আমরা Facial expression/Gestures আমরা শিক্ষার্থীদের বুঝাতে পারি। ইংরেজি ডিকশনারিতেও এসব শব্দের প্রকাশ ছবির মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

৫। সমার্থক বা বিপরীতার্থক শব্দ দিয়ে (Antonym/Synonym) : আবার কিছু কিছু শব্দ যেগুলো শিক্ষার্থীদের ইতিমধ্যে জানা, এ শব্দগুলোর বিপরীত বা সমার্থক শব্দ বলে দিলে শিক্ষার্থীরা সহজেই আত্মস্থ করবে পারবে।

৬। প্রসঙ্গ থেকে বা অনুমান করে Vocabulary শেখানো বা শেখা হয় (Inferring/guessing meaning from the context): আমরা কোনো আর্টিকেল বা বিষয় পড়তে গিয়ে অনেক শব্দের সরাসরি অর্থ জানি না অথচ উক্ত বিষয়টি আমরা বুঝতে পারি অর্থাৎ অনেক শব্দের অর্থই আমরা অনুমান করে নিই বা context (প্রসঙ্গ) থেকে বুঝতে পারি। এসব ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ কোনো ডিকশনারি দেখা হয়নি বা কোনো শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই আমরা অর্থ বুঝে ফেলেছি। Vocabulary শেখানোর সময়ও আমরা একটি বাক্য লিখে সেখানে এমন একটি শব্দ ব্যবহার করব যার অর্থ শিক্ষার্থী বাক্যটি পড়েই বুঝতে পারবে। আলাদা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হবে না।

৭। মূকাভিনয় বা অ্যাকটিংয়ের মাধ্যমে (Miming/Acting): মাধ্যমে আমরা অনেক শব্দের অর্থ শিক্ষার্থীদের বোঝাতে পারি।

www.pathagar.com

৮। প্রদর্শন বা ডিমনেস্ট্রশনের মাধ্যমে (Demonstration-announcement, procession, Queue): যেমন কোনো কিছু ঘোষণা করা, লাইনে দাঁড়ানো, বক্তৃতা দেয়া ইত্যাদি আমরা Demonstration-এর মাধ্যমে দেখাতে পারি। এভাবে দেখাতে পারলে শিক্ষার্থীদের মনে দাগ কেটে থাকে।

উপরোক্ত বিষয়গুলো আমরা সহজে এভাবে বলতে পারি–

কোনো কোনো শব্দের অর্থ বোঝানোর জন্য সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা দেয়া প্রয়োজন। অনুবাদের মাধ্যমে আমরা অনেক শব্দের অর্থ ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে পারি। dictionary-এর সাহায্যে আমরা অনুবাদের মাধ্যমে শব্দের অর্থ বুঝতে পারি। বাস্তব চিত্র প্রদর্শন করে, ছবি দেখিয়ে বা চার্ট দেখিয়ে আমরা শব্দের অর্থ বুঝিয়ে দিতে পারি। যতগুলো সম্ভব বাস্তব বস্তু প্রদর্শনের মাধ্যমে আমরা ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝিয়ে দিতে পারি। প্লেনকে আমরা হাতের মুঠোয় এনে দেখাতে পারব না, তবে একটি কলম হাতে নিয়ে প্লেনের মতো করে দেখাতে পারি। কিছু কিছু শব্দ যেমন রাগ, ক্রোধ, খুশি হওয়া ইত্যাদি Facial expression/Gestures-এর মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি। কিছুকিছু শব্দ বিপরীত বা সমার্থক শব্দ ব্যবহার করে শেখাতে পারি। মূকাভিনয় এবং অ্যাকটিংয়ের মাধ্যমেও আমরা শব্দের অর্থ বোঝাতে পারি। ডিমনেস্ট্রশনের মাধ্যমে আমরা শব্দের অর্থ শেখাতে পারি। যেমন কোনো কিছু ঘোষণা করা, লাইনে দাঁড়ানো এবং মিছিলে অংশগ্রহণ করা ইত্যাদি।

আপনি নতুন শব্দ এবং শব্দের ব্যবহার জানার জন্য ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা নিয়মিত পড়বেন। ইংরেজি পত্রিকা কেন? কারণ আমরা খবরাখবর জানার জন্য প্রতিদিন সংবাদপত্র পড়ি। অনেক শব্দ হয়তো বুঝবে না কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে অনেক শব্দই বুঝতে পারবেন। শব্দ বুঝতে না পাড়লে বিরক্ত হবেন না বা পড়া বন্ধ করে দিবেন না বা বারবার ডিকশনারি খুঁজবেন না, পড়া চালিয়ে যাবেন। কারণ পুরো বিষয়টি পড়লে বা আরও দু-একটি আর্টিকেল পড়লে অনেক শব্দের অর্থ এবং ব্যবহার আপনি ওখান থেকেই বুঝতে পারবেন। সব সময় মনে রাখতে হবে শব্দ ব্যবহার করতে পারাটাই হচ্ছে আপনার টার্গেট এবং সার্থকতা আর vocabulary শেখা মানেও তাই, শুধু শব্দের অর্থ জানা মানে vocabulary শেখা নয়। Longman Dictionary-'বলা হয়েছে Reading is one of the best ways of improving your vocabulary.

www.pathagar.com

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নিয়ে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ, দেশের আর্থসামজিক উন্নয়ন, জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে প্রাথমিক পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার ৮৭%এ পৌছেছে। অর্থাৎ এখনও ১৩% শিক্ষার্থী যাদের বিদ্যালয়ে আসার কথা, তারা বিদ্যালয়ে আসছে না। এই হিসেবে ২৩ লাখ শিক্ষার্থী শিক্ষার বাইরে থেকে যাচ্ছে। আবার যারা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হচ্ছে, তাদের ৪৮ ভাগই দশম শ্রেণি পর্যন্ত পৌছায় না। দরিদ্রতা অন্যতম কারণ। দারিদ্র্য যেহেতু একটি ব্যাপক বিষয়, সরকার ও জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেটা দূরীভূত করা সম্ভব। তবে এটি একটি সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। স্কুলের একজন শিক্ষক কিংবা শ্রেণিশিক্ষক দারিদ্র্যবিমোচন বা দূরীকরণের জন্য ব্যক্তিগতভাবে সরাসরি হয়তো কোনো অবদান রাখতে পারেন না, তবে পরোক্ষভাবে বিশাল অবদান রাখেন বা রাখতে পারেন। শিক্ষার্থীর পরিবার এবং রাষ্ট্র দারিদ্র্যমুক্ত হলে শিক্ষার্থী ভর্তির হার স্বভাবতই বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু যারা ইতিমধ্যে ভর্তি হয়েছে, তাদেরকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখার দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের, তার চেয়ে বড় দায়িত্ব স্কুল এবং শিক্ষকদের। দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে, সেখানে সরাসরি হয়তো শিক্ষকদের তেমন কিছু করার নেই, তবে দারিদ্র্য ছাড়াও শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। শিক্ষার্থীকে ধরে রাখার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষ, শ্রেণিশিক্ষক ও বিষয় শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

আমাদের দেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিশেষ করে গ্রামে বড় বড় মাঠ আছে, স্কুলের চারপাশে রয়েছে বেশ খালি জায়গা অথচ এই জায়গাগুলো খালি পড়ে থাকে প্রায় সারা বছরই। এসব খালি জায়গায় সুন্দর সুন্দর ফুলের বাগান করা যায়। ফুলের বাগান করলে ছাত্রছত্রীদের স্কুলের প্রতি আকর্ষণ বেড়ে যাবে। স্কুলের প্রতি তাদের এক ধরনের অংশীদারিত্ব বাড়বে। স্কুলগৃহ এবং চারপাশ ফুল ও ফল

www.pathagar.com

বাগান দিয়ে সাজিয়ে রাখলে সত্যিকার অর্থেই স্কুলকে এক স্বপ্নিল জগত মনে হবে শিক্ষার্থীদের কাছে। এক অজানা আকর্ষণ তাদেরকে স্কুলের দিকে নিয়ে আসবে।

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা বিশ্বের বৃহত্তম প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম। এখানকার প্রাথমিক শিক্ষায় ১৬.৪ মিলিয়ন ছেলে-মেয়ে লেখাপড়া করে, যাদের বয়স ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। প্রাথমিক শিক্ষায় ৩৬৫৯২৫ জন প্রাথমিক শিক্ষক রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ৫৩% শিক্ষিকা এবং ২৩% মহিলা প্রধান শিক্ষিকা। বাংলাদেশে ৮২২১৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। মাদ্রাসাসহ ১০ ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আমাদের ছেলে-মেয়েরা লেখাপড়া করে থাকে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে সত্যিকার অর্থেই শিক্ষিত করে তুলতে হলে সর্বাগ্রে নজর দিতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার দিকে। আমাদের অধিকাংশ গ্রাম্য প্রাথমিক বিদ্যালয় দুই থেকে তিনজন শিক্ষক দ্বারা পরিচালিত। টিআইবির মতে, প্রায় ৭৩% রেজিস্টার্ড বেসরকারি শিক্ষক বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ পাননি। অতিরিক্ত ক্লাসরুমের অভাবে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীরা খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করে। অর্থনৈতিক কারণ ছাড়াও এ কারণগুলো ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ের দিকে আকৃষ্ট করে না। তা ছাড়া দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অব্যবস্থাপনায় ভর্তি প্রাথমিক শিক্ষা পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতি বিরাজ করছে এখানে। উপজেলা শিক্ষা অফিসার থেকে শুরু করে উচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দুর্নীতি বিরাজ করছে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে রয়েছে দুর্নীতি। কবে এবং কীভাবে এগুলো দূর হবে সে নিয়ে চিন্তিত সংশ্লিষ্ট সবাই। প্রাথমিক শিক্ষার মান তো দূরের কথা, সকল ছেলে-মেয়েদের স্কুলে নিয়ে আসা এবং আনার পরে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকালীন সময় পর্যন্ত তাদেরকে স্কুলে ধরে রাখা নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে। শুধু সরকার বা প্রাথমিক শিক্ষার সাথে জড়িত সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দই পারবে না, এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করতে। সকল শ্রেণির মানুষকে এগিয়ে আসতে হবে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নত করতে। শহর অঞ্চলের দরিদ্রদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার উল্লেখযোগ্য হারে কম। শহরের কোথাও কোথাও প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার গ্রামের চেয়েও কম। এ বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে সবাইকে। বাংলাদেশে ২০১৫ সালের মধ্যে ৯৫% শিক্ষার্থীকে স্কুলে ভর্তি করানোর পরিকল্পনা নিয়েছে পিইডিপি-২ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। ৪০০০০ অতিরিক্ত ক্লাসরুম, ৩৯৭ উপজেলায় রিসোর্স সেন্টার, ৩৯৮ স্কুল কাম সাইক্লোন সেন্টার নির্মিত হয় পিইডিপি-২-এর আওতায়। প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে ও শিক্ষাব্যবস্থাপনাকে আরো উন্নত করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগীয় কর্মকর্তাগণের পক্ষ থেকে দীর্ঘদিন যাবৎ

www.pathagar.com

দাবি জানানো হচ্ছে। দ্বিতীয় প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পিইডিপি-২তেও প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার গঠনের প্রস্তাব আছে, পিইডিপি-২ শেষ হওয়ার পথে অথচ প্রাথমিক শিক্ষা ক্যাডার আজো গঠিত হয়নি। আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনেকেই এখন উচ্চ শিক্ষিত ও মেধাবী। সরাসরি নিয়োগকৃত প্রধান শিক্ষকগণের ন্যূনতম যোগ্যতা মাস্টার্স ডিগ্রি। বেকারত্ব ও ভালো চাকরির সীমিত সুযোগের জন্যই তারা শিক্ষকতা পেশায় আসেন। স্বেচ্ছায় প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করা সত্ত্বেও নিম্ন বেতন স্কেল আর পদোন্নতির সুযোগ না থাকায় তাদের মাঝে সন্তুষ্টি থাকে না। মনেপ্রাণে বা মহান ব্রত হিসেবে শিক্ষকতাকে দেখতে পারেন না। তারা শিক্ষকতা না করে চাকরি করেন। তারা মূলত অভিভাবকদের উপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে কিছুটা আত্মনির্ভরশীল হয়ে অন্য চাকরি খোঁজার জন্যই শিক্ষকতা করেন। উচ্চশিক্ষিত নিম্ন বেতন স্কেলে সারাজীবন একই পদে চাকরি করায় হীনম্মন্যতা ও হতাশায় ভোগেন এসব শিক্ষক। সামাজিকভাবেও তাদের সেভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তখনই শিক্ষকতা পেশায় স্বেচ্ছায় আসবেন এবং আসার পর থেকে যাবেন যদি উপরে উঠার সিঁড়ি থাকে এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা থাকে। অনেক উন্নত বিশ্বেই মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকতা পেশায় আসেন, তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন-ভাতা দেয়া হয়, শুধু প্রাইমারি শিক্ষক বিবেচনায় নয়। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা চালু করতে পারলে প্রাথমিক শিক্ষার মান অবশ্যই উন্নত হবে।

বাংলাদেশে নারীশিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আশির দশক থেকে। গ্রামাঞ্চলে মেয়েদের অধিকহারে শিক্ষাঙ্গনে আসতে মাধ্যমিক স্তরে উপবৃত্তি এবং বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। নারী-নির্যাতন রোধে কঠোর আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। মেয়েদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত করার পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো নারী উন্নয়নে দৃষ্টিগ্রাহ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ সংস্থাগুলো মেয়েদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজে নিয়োগ দিচ্ছে। সরকারি-বেসরকারিভাবে দরিদ্র ও গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলতে তাদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সমবায় সমিতি এবং ঋণ প্রদান কর্মসূচির ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যেরও বিকাশ ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে নির্বিচারে নারীর ওপর নির্যাতনের দিন শেষ হয়ে আসছে। এখন যেটি প্রয়োজন তা হচ্ছে পাঠ্যসূচিতে নারী-শিক্ষার বিস্তার ও জেন্ডারবিষয়ক পাঠ সংযোজন করা। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক প্রায় নারী। তাই নারীকে পেছনে রেখে এ দেশের অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব নয়।

www.pathagar.com

নারীকে উন্নয়নের মূলধারায় আনতে হলে প্রথম পদক্ষেপই হচ্ছে শিক্ষা। কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে নারীর গতি শ্লথ। এ দেশে ছেলেশিশুর তুলনায় মেয়েশিশুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ১৪ শতাংশ কম এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে তা বর্তমানে প্রায় সমান। এটি একটি ভালো দিক। তবে প্রাথমিক শিক্ষার পর মাধ্যমিক স্তরের অষ্টম থেকে দশম শ্রেণিতে মেয়ে শিক্ষার্থীর ঝরেপড়ার হার অত্যন্ত বেশি। কারণ মেয়েদের ক্ষেত্রে পড়ালেখাকে প্রয়োজনীয় মনে না করা, মেয়েদের ওপর ঘর-গৃহস্থালির কাজকর্মের দায়-দায়িত্ব অর্পণ করা, অল্প বয়সে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয়া, সিদ্ধান্ত গ্রহণে মেয়েদের মতামতের গুরুত্ব না দেয়া। এক গবেষণায় দেখা গেছে, শতকরা ৬০ ভাগ মেয়ে শিক্ষার্থী বিয়ে হওয়ার কারণে মাধ্যমিক শ্রেণি থেকে ঝরে পরে।

ঢাকা শহরের সুবিধাবঞ্চিত পাঁচ লাখ শিশুর জন্য স্কুলসহ ৭৩টি শিশুকল্যাণ ট্রাস্ট স্কুল প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বর্তমান সরকার। ১৯৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯ এবং ৯০ পর্যন্ত সাবেক রাষ্ট্রপ্রধান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদেরও এই শিশুদের জন্য 'পথকলি ট্রাস্ট' নামে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পারেননি। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায়, সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কথা বলে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় থেকে বিভিন্নরকম অনুদানের লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে কিছু সংগঠন। বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা গেছে, আগের দুটি প্রকল্প ব্যর্থ হওয়ার পর তৃতীয় মেয়াদে দাতা সংস্থাগুলোর অর্থায়নে 'টেকসই' পরিকল্পনার আলোকে সংশোধিত প্রকল্প হাতে নিয়েছে। 'রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন' শীর্ষক প্রকল্পের সম্ভাব্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৮৫ কোটি টাকা। রাজধানী ঢাকায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরের সংখ্যা ৫ লক্ষ। এই ৫ লক্ষ শিশু-কিশোরদের আক্ষরিক জ্ঞান, খাবার চাহিদা আর বাসস্থান সমস্যার সমাধানের জন্য 'আনন্দ স্কুল' নামে প্রকল্পটি যথেষ্ট ভূমিকা রাখতে পারে। সারাদেশে ৭০ লাখ ৬০ হাজার শিশু-কিশোর আছে, যারা সুবিধাবঞ্চিত। এরা কেউ স্কুলে যেতে পারছে না বিভিন্ন কারণে। কারণগুলো শনাক্ত করে এই শিশুদের শিক্ষার জন্য বিশেষ কিছু একটা করা দরকার।

বর্তমান সরকার মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের জন্য একটি বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সেটি হচ্ছে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দেয়া।

এনসিটিবির চেয়ারম্যান বলেছেন, বিনামূল্যে বই বিতরণ করার কারণে পাঠ্যবইয়ের চাহিদা প্রায় ১৭ শতাংশ বেড়ে গেছে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তারা সঠিক চাহিদাপত্র দিতে না পারায় সংকট হয়েছে। এনসিটিবির গুদামে

www.pathagar.com

রহস্যজনক অগ্নিকাণ্ডের কারণেও হয়েছে। অতি অল্প সময়ে ২০১৩ সালের জন্য সরকার ২৭ কোটি বই ছেপেছে। ইংরেজি ভার্সন ও কিন্ডারগার্টেন স্কুলে বই সরবরাহের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু কালক্ষেপণ যে হয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এখানে একটু আলোচনা করার সুযোগ আছে, সেটি হচ্ছে শহরের, উপজেলার স্কুলগুলোতে যারা পড়ে, তাদের অবস্থা এমন নয় যে, এক সেট বই তারা কিনতে পারবে না। বরং এসব স্কুলের ছেলে-মেয়েরা প্রাইভেট পড়ে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে। প্রাইভেট তারা বাধ্য হয়ে পড়ছে। প্রাইভেট পড়ার পেছনে যে, অর্থ, সময়, শক্তি ও মেধা ব্যয় হচ্ছে সে অনুযায়ী তারা ফল পাচ্ছে না। সরকারের বেশি নজর দেয়া দরকার ছিল এই বিষয়টির প্রতি। সুদূর পল্লীর স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে বই সরবরাহ করা হলে বরং আসল দরিদ্র ছেলেমেয়ে ও অভিভাবকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হতো। ঢাকাসহ সব শহরের নামীদামি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা একাধিক শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে, তাদের দরকার ছিল না সরকারি একসেট বই বিনামূল্যে পাওয়া। তাছাড়া পুস্তক প্রকাশনার সাথে বা বই ব্যবসার সাথে যারা জড়িত, তাদের ব্যবসাও চলত অনেকটা। গ্রামীণ স্কুলগুলোর অধিকাংশই অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত। কোনো কোনো স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীর তুলনায় শ্রেণিকক্ষের সংখ্যাও অপ্রতুল। শিক্ষকদের বসার তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই। অনেক স্কুলে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র নেই। কোনো স্কুলে শ্রেণিকক্ষে ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে ক্লাস করে। স্কুল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা কিংবা দক্ষতার ঘাটতির কারণে অনেক জায়গায় অনেক ধরনের সমস্যা হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা যখন কোনো আনন্দ পায় না স্কুলে, তখন তাদের মধ্যে স্কুল থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে বিনামূল্যে এক সেট বই, টিফিন এবং পরিচ্ছন্ন স্কুলগৃহ শিক্ষার্থীদের স্কুলের প্রতি আকৃষ্ট করবে।

স্কুলগামী অনেক মেয়েরা বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পথে-ঘাটে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগে এবং স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেয়। সমাজপতিদের দৃষ্টিভঙ্গি, পথে-ঘাটে বখাটেদের উৎপাত, বিভিন্ন মন্তব্য, অশালীন উক্তি, দোষীদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেয়া ইত্যাদি কারণে অনেক মাতা-পিতা বাধ্য হয়ে মেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দেন। এই বিষয়টি এখন বিশেষভাবে দেখার সময় এসেছে।

১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়ে থাকে। কিন্তু এই পনেরো বছরে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে দুই কিংবা তিনগুণ। সে অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে শিক্ষার গুণগতমান রক্ষা করা যাচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, বিষয়টি তারা অর্থ ও

www.pathagar.com

সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ইতিমধ্যে প্রেরণ করেছেন। দেখা যাক কী হয়। তবে যত দ্রুত সম্ভব এ ব্যাপারে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

১৯৭৩ সালে যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশে ৩৬১৬৫টি বিদ্যালয় এবং ১৫৭৭২৪ জন শিক্ষকের চাকরি জাতীয়করণ করেছিল তৎকালীন সরকার। দেশ গঠন তথা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর কথা ছিল। দীর্ঘ আটত্রিশ বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ে তেমন একটা কাজ হয়নি। ফলে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীরা কাঙ্ক্ষিত দক্ষতা থেকে অনেক দূর অবস্থান করে। আর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু হয়নি শুধু পাসের হার বৃদ্ধি ছাড়া। পাসের হার বৃদ্ধি আর সত্যিকার অর্থে দক্ষতা অর্জন এবং জ্ঞান অর্জন করা এক কথা নয়। এই ব্যাপারটি আমাদের বুঝতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক সমিতি

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির পরিচালক ড. শফিকুল ইসলাম মাঝে মাঝে বলে থাকেন, "আমাদের দেশের শিক্ষক ও শিক্ষা গবেষকগণ এবং শিক্ষার সাথে জড়িত অনেকেই শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রশাসনিক পদগুলো পাওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকেন। এই পদ পাওয়ার পর ব্যতিক্রম ছাড়া সবাই পড়াশুনা ছেড়ে দিয়ে প্রশাসনিক কার্যাবলি নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করেন।"

আমার মনে আছে, ক্যাডেট কলেজের আমার এক প্রাক্তন সহকর্মী যেদিন ভাইস-প্রিন্সিপাল হওয়ার চিঠি পেলেন, সেদিনই মহা উৎসাহে তার টেবিলে সমস্ত বই তার জুনিয়র সহকর্মীদের বিলি করে দিলেন। তার চোখে-মুখে এক ধরনের প্রশান্তি লক্ষ করলাম। তার চোখ-মুখ প্রকাশ, ভাব-ভঙ্গি সব বলে দিচ্ছে সে কী আনন্দ, তাকে এই বইপুস্তক আর পড়তে হবে না, বই নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হবে না। সাথে সাথে আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে গেল। আমি যখন সরকারি বিএম কলেজের উচ্চ মাধ্যমিকে ছাত্র, তখন আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল সপ্তাহে এক-দুদিন ক্লাস নিতেন। উপাধ্যক্ষের অফিস কলেজের পশ্চিম প্রান্তে এবং আমাদের ক্লাস পূর্ব প্রান্তে। তাকে ক্লাস করতে অনেক বিল্ডিং ও ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় পেরিয়ে আসতে হতো। এটি তার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও রুচি, তিনি তার শিক্ষকতা পরিচয়টিই বড় করে দেখতে চান।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক অধ্যাপক নিজস্ব গবেষণাকর্ম ও পাঠদানের চেয়ে ভাইস চ্যান্সেলর, ডিন কিংবা শিক্ষক সমিতির সভাপতি হতে বেশি পছন্দ করেন। ওইসব পদে যাওয়ার জন্য তদবির করেন, ব্যস্ত থাকেন, ক্লাস নেন না। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কিছু কিছু শিক্ষকদের দেখতাম নির্বাচন নিয়ে খুব ব্যস্ত, অথচ আমরা অপেক্ষা করতাম তাদের ক্লাসের জন্য, কিন্তু ক্লাসে প্রায়ই আসতেন না। তারা

www.pathagar.com

মোটরসাইকেল কিংবা মাইক্রোবাসে চড়ে লবিং করছেন, ভোট প্রার্থনা করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক নিজেই একটি প্রতিষ্ঠান, এ কথা তারা ভুলে যান।

শিক্ষক সমিতির কোনো পদে থাকা মানে তাকে ক্লাস নিতে হবে না, পড়াশুনা করতে হবে না বা পড়াশুনা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে না। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন তাকে সহজে কিছু বলার সাহস পাবে না। সভা-সমিতি, মিটিং-সেমিনার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারবেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষক সবাই তাকে চিনবে।

ক্যাডেট কলেজে দেখেছি, একজন সহযোগী অধ্যাপক যদি কোনো পিয়নকে কোনো আদেশ দিতেন, পিয়ন সেটি পালন করত মন্থর গতিতে। অনেক সময় ভুলে যাওয়ারও চেষ্টা করতেন। কিন্তু অ্যাডজুটেন্ট যদি কোনো নির্দেশ দিতেন, সেটি মুহূর্ত দেরি না করে পালন করত তারা। এই যখন অবস্থা, তখন প্রশাসনিক পদ পাওয়ার জন্য সবাই উদগ্রীব তো থাকবেই। তারপরেও কথা থেকে যায়।

একইভাবে কলেজের শিক্ষকগণ অধ্যক্ষ হতে চান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ প্রধান শিক্ষক হতে চান।

আমাদের দেশের শিক্ষক সমিতিগুলো মিটিং সমাবেশ, পুস্তক নিয়ে ব্যবসা ইত্যাদি নিয়ে যত বেশি ব্যস্ত থাকে, তার সিকিভাগের একভাগও পেশাগত উন্নয়ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখা যায় না। শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন, নারীশিক্ষার প্রসার, বাল্যবিবাহরোধ, এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযান, মাদকাসক্তি, যৌতুকপ্রথা বাতিল ইত্যাদি রোধে তেমন একটা ভূমিকা রাখছে না। সমাজ উন্নয়নে শিক্ষক সমিতিগুলোকে সব ভূমিকা পালন করতে হবে, তবেই সমিতিগুলো আরও গতিশীলতা ফিরে পাবে।

সকল সমিতির প্রধান একটি ভাবনা থাকে যে অর্থনৈতিক উন্নয়ন। মিটিং, মিছিল, বক্তৃতা সবকিছুই প্রধান একটি পয়েন্ট ঘিরে থাকে। হ্যাঁ, সরকারের দায়িত্ব দেশের জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষাব্যবস্থা সঠিকভাবে প্রণয়ন ও পরিচালনা করা। কিন্তু অন্যান্য পেশার চেয়ে শিক্ষকতা পেশা একটু আলাদা আর তাই সরকারের আর্থিক সঙ্গতি বিবেচনায় রেখে শিক্ষকদের এসব ব্যাপারে দাবি-দাওয়া পেশ করা উচিত, কারণ তারা জাতির অভিভাবক, আর অভিভাবকদেরকে সবকিছু নিয়ে ভাবতে হবে।

আমি দেখেছি, শিক্ষকদের পাঠদানের দৈন্যদশা নিয়ে কোনো শিক্ষক সমিতি এতটুকু চিন্তিত নয়। তাদের কোনো ধরনের প্লান বা প্রোগ্রাম নেই শিক্ষকদের

www.pathagar.com

পেশাগত উন্নয়নের। এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতিগুলো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে তা হচ্ছে–

(১) নির্দিষ্ট সময় অন্তর শিক্ষকগণ নিজ এলাকায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে পারে। সরকারকে বাধ্য করতে পারে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য দেশে-বিদেশে তাদের প্রেরণ। নির্দিষ্ট সময় পর পর নিজ নিজ বিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের ক্লাস অন্যজন দেখা, ফিডব্যক দেয়া, নতুন নতুন চিন্তা করা যে শিক্ষকতা কত মজার উপায়ে করা যায়।

(২) শিক্ষক সমিতিগুলো এক স্কুলের খাতা অন্য স্কুলের শিক্ষক দ্বারা পরীক্ষণ করানো জোরেশোরে চালু করতে পারেন এবং সেখানে খাতা দেখার জন্য ফি নির্ধারণ করতে পারেন।

www.pathagar.com

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা নিয়ে কিছু কথা

ক্যাডেট কলেজসমূহ বাংলাদেশের শিক্ষাঙ্গনে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। ১৯৫৮ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে ক্যাডেট কলেজ শিক্ষার যাত্র শুরু। ক্যাডেট কলেজগুলোর অভাবনীয় সাফল্য এবং সামরিক ও বেসামরিক পর্যায়ে উপযুক্ত নাগরিক ও মানবসম্পদ তৈরির ক্ষেত্রে যে অনন্য অবদান রেখেছে, তারই ফলশ্রুতিতে আজ অমাদের দেশে ১২টি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ১২টির মধ্য নয়টি ছেলেদের এবং তিনটি মেয়েদের। আমাদের দেশে শিক্ষার যে মান এবং স্কুল ও কলেজের যে পরিবেশ, তাতে খুব কম অভিভাবকই সন্তানকে স্কুল কিংবা কলেজে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো বড় বড় শহবে সীমাবদ্ধ আর এখানে সন্তানদের যারা ভর্তি করান, তারা সাধারণত অবস্থাপন্ন। তারপরেও তারা হিমশিম খান ইংরেজি মাধ্যমের খরচ বহন করতে কারণ প্রতিটি বিষয়ই প্রাইভেট শিক্ষকের কাছে পড়তে হয়। বাংলা মাধ্যমে নামীদামি কয়েকটি স্কুল ও কলেজ দেশে গড়ে উঠেছে, সেগুলো সবই প্রাইভেট সেক্টরে। এসব স্কুল ও কলেজে ভর্তি হওয়া মরণাপন্ন অবস্থা। ভর্তির পরে শুরু হয় প্রাইভেট বাণিজ্য। তাছাড়া এসব স্কুল-কলেজে কোচিং সেন্টারের মতো শুধু বিষয় নিয়েই আলোচনা ও পড়াশুনা হয়। সহপাঠক্রমিক কোনো বিষয় তেমন একটা গুরুত্ব পায় না। যেখানে সহপাঠক্রমিক কার্যাবলি আছে, তাতে সকল ছাত্র-ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই দিকে দিয়ে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা মোটামুটি আদর্শ শিক্ষা। আর তাই শিক্ষিত, চাকরিজীবী এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির অভিভাবকগণ চান ছেলে ও মেয়েকে কোনো ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করতে। উচ্চ শিক্ষায় প্রবেশ

www.pathagar.com

করার পূর্ব পর্যন্ত মোটামুটি নিশ্চিন্ত। তাছাড়া স্কুলে নিয়ে যাওয়া, নিয়ে আসার ঝামেলা নেই। নিরাপত্তার বিষয়টিও মোটামুটি ভালো। কিন্তু ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার জন্য কিছু নিয়মকানুন রয়েছে। ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক হিসেবে অনেক অভিভাবকই প্রশ্ন করেন কীভাবে ভর্তি করাবেন তাদের সন্তানদের। আমি নিজেও অনেক পরিচিত কিংবা হঠাৎ পরিচিত হওয়া অনেক অভিভাবককে অনুরোধ করি, তাদের সন্তানদের ক্যাডেট কলেজে ভর্তি করাতে। এসব অভিভাবকদের এবং ক্যাডেট কলেজে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের মোটামুটি একটি ধারণা দেয়ার জন্যই এই লেখা।

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি হওয়ার ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন নিয়ম সংযোজন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। প্রার্থী এবং অভিভাবকদের জন্য বিষয়গুলো ভালোভাবে জানা দরকার। আমি ক্যাডেট কলেজে থাকাকালীন কিছু বিষয় নিয়ে কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছিলাম ঐ বিষয়গুলোতে কিছু পরিবর্তন নিয়ে আসতে। বর্তমানে ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়ে শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত আছি, কিন্তু ক্যাডেট কলেজের প্রতি দুর্বলতা এবং আগ্রহ দুটোই এখনও আছে। ক্যাডেট কলেজে ভর্তিসহ বিষয়ে বেশ কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। যথাযথ কর্তৃপক্ষের সাথে আলাপ করে বেশ ভালোই লেগেছে।

আমরা জানি, ক্যাডেট কলেজ আমাদের দেশে এক ভিন্ন ধরনের এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এখানে প্রতিবছর সপ্তম শ্রেণিতে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়। আমাদের দেশের কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সপ্তম শ্রেণি থেকে ভর্তি শুরু হয় না। জাতীয় ইংরেজি ও বাংলা সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ভর্তির আবেদনপত্র আহ্বান করা হয়ে থাকে। সাধারণত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে আবেদনপত্র বিতরণ শেষে জানুয়ারি মাসে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত, মৌখিক পরীক্ষা ও ডাক্তারি পরীক্ষার ভিত্তিতে সম্মিলিত মেধা তালিকা প্রণয়ন করে চূড়ান্ত প্রার্থী নির্বাচন করা হয়। লিখিত পরীক্ষায় মোট ২০০ নম্বরের হয়। নম্বর বণ্টন এভাবে– ইংরেজিতে ৮০, গণিতে ৬০, বাংলা ৪০ ও সাধারণ জ্ঞানে ২০ নম্বরের পরীক্ষা দিতে হবে ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীদের। দেখা যাচ্ছে ইংরেজিতে সবচেয়ে বেশি নম্বরে পরীক্ষা দিতে হয়, কারণ ক্যাডেট কলেজে সর্বদাই ইংরেজির উপর জোর দেয়া হতো আর বর্তমানে প্রতিটি কলেজে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজি (ইংরেজি ভার্সন)। সাধারণত ৬ষ্ঠ শ্রেণির অথবা সমমানের পাঠ্যক্রম অনুসরণে প্রশ্নপত্র প্রণীত হয়।

www.pathagar.com

উল্লেখ্য, ক্যাডেট কলেজসমূহে শিক্ষা মাধ্যম ইংরেজি, তবে প্রার্থী ইচ্ছে করলে ভর্তি পরীক্ষা বাংলা ও ইংরেজি উভয় মাধ্যমে দিতে পারবে। প্রার্থী তার আবেদনপত্রে ভর্তি পরীক্ষার মাধ্যম উল্লেখ করবে। চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীকে ক্যাডেট কলেজের চাহিদা মোতাবেক প্রয়োজনীয় সকল তথ্য ও সনদপত্রাদি সরবরাহ করতে হয়, অন্যথায় প্রার্থীর নির্বাচন বাতিল বলে গণ্য হয়।

ভর্তি-ইচ্ছুক প্রার্থী নির্দিষ্ট ফি পরিশোধ করে বিজ্ঞাপনে উল্লিখিত কলেজে আবেদনপত্র জমা দিবে। আবেদনকারীকে বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে। ভর্তি বছরের ১ জানুয়ারি তারিখে বয়স সর্বনিম্ন ১২ বছর ও সর্বোচ্চ ১৪ বছর হতে হবে। কোনো প্রার্থী পূর্বে একবার ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হলে এবং ক্যাডেট কলেজে অধ্যয়নরত অবস্থায় যদি তা প্রকাশ পায়, সেক্ষেত্রে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ আদায় সাপেক্ষে তাকে বহিষ্কার করা হয় এবং প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। অতএব অভিভাবক এবং প্রার্থী সকলের উদ্দেশ্যে বলছি, কেউ যাতে দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে। প্রতিবছর ভর্তি পরীক্ষার যাবতীয় তথ্য অত্যন্ত উন্নত ও আধুনিক পদ্ধতিতে আর্মি হেডকোয়ার্টারসে (ক্যাডেট কলেজ ব্রাঞ্চে) সংরক্ষণ করা হয়। দ্বিতীয়বার পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রার্থীকে সহজেই শনাক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

পূর্বে দেখা যেত, একজন প্রার্থী একটিমাত্র কলেজে ভার্ত হওয়ার জন্য পছন্দ দিতে পারত, কোনো পছন্দক্রম ছিল না। ফলে দেখা যেত, একজন প্রার্থী ঢাকার কাছাকাছি কলেজ যেমন মির্জপুর কিংবা কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজ ভর্তির জন্য ফরম পূরণ করেছে এবং ৭৮ শতাংশ নম্বর পেয়েছে অথচ চান্স পায়নি কারণ এই দুই কলেজের প্রতিটিতে ঢাকার প্রার্থীরা বেশি ভিড় করে এবং তাদের মধ্য তীব্র প্রতিযোগিতা হয়। আর ঢাকার প্রার্থী বলে তাদের পরীক্ষাও ভালো হয়। আবার রংপুর কিংবা রাজশাহীতে দেখা যায়, একজন প্রার্থী ৭৪ শতাংশ নম্বর পেয়েও সহজেই ভর্তি হতে পারত। একই প্রশ্নপত্রে পুরো দেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান নিয়মানুযায়ী, একজন প্রার্থী দুটো কলেজে তার পছন্দক্রম দিতে পারবে এবং তৃতীয় আর একটি ঘর আছে সেখানেও সে পছন্দক্রম দিতে পারবে। এই ঘর পূরণ করার অর্থ হচ্ছে কোন প্রার্থী যদি তার বাছাইকৃত কলেজে ভর্তি হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাছাইকৃত কোনো কলেজে ভর্তি হওয়ার সুযোগ থাকবে। এটি একটি চমৎকার পদ্ধতি। কারণ একজন প্রার্থী তার পছন্দের কলেজে

www.pathagar.com

ভর্তি হতে না পারলে ক্যাডেট কলেজে পড়ার স্বপ্ন ভেঙে যেত, এখন তা থেকে অনেকটাই আশার পথ তারা দেখবে। ভর্তি সুযোগ থেকে একেবারে বঞ্চিত হবে না।

ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্রেও আনা হয়েছে বেশ কিছু পরিবর্তন। যেমন, পূর্বে সাধারণ জ্ঞান প্রশ্নে কোনো এক অখ্যাত দেশের মুদ্রার নাম কী তা একজন প্রার্থীকে জানতে হতো। আর এই সুযোগে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারগুলো কচি ছেলে-মেয়েদের অনেক অদ্ভুত তথ্য মুখস্থ করিয়ে মাথা ভর্তি করে ফেলত অথচ এই তথ্য জানা বা না জানা দিয়ে একজন প্রার্থীর মেধা যাচাই যেমন হয় না, তেমন এগুলো তার কলেজ জীবনেও তেমন কোনো কাজে আসে না। বর্তমান পদ্ধতিতে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন সাধারণত ৬ষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান বই থেকে আসবে অর্থাৎ প্রার্থীদের অযথা হয়রানি বা আজেবাজে তথ্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হবে না। সাম্প্রতিক দেশে ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা তাকে জানতে হবে। অন্য কোনো মহাদেশে বা অখ্যাত কোনো দেশে কিছু ঘটেছে কি না তা জানার তেমন আর প্রয়োজন নেই। পূর্ববর্তী পরীক্ষাগুলোতে কোনো সিলেবাস দেয়া হতো না। প্রার্থীর মোটামুটি সাগরে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হতো। ৬ষ্ঠ, ৭ম এমনি ৮ম শ্রেণির বই থেকেও অনেক সময় প্রশ্ন প্রণয়ন করা হতো। এখন ভর্তি ফরম নেয়ার সাথে সাথে প্রার্থীকে একটি সিলেবাস ও প্রসপেক্টাস দেয়া হয়, সেখানে মোটামুটি সকল তথ্যাদি সন্নিবেশ করা থাকে।

ভর্তি পরীক্ষার প্রবেশপত্র আগে ডাকযোগে পাঠানো হতো, ফলে অনেক প্রবেশপত্র মিস হতো। প্রার্থী ও অভিভাবক অত্যন্ত টেনশনে থাকতেন। বর্তমান পদ্ধতিতে ফরম নেয়ার সাথে সাথে প্রার্থী বা অভিভাবকদের হাতে প্রবেশপত্র দিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। বর্তমানে দেশে ১২টি ক্যাডেট কলেজে ৬০০ ক্যাডেট ভর্তি করা হয় প্রতিবছর। ৬০০ সিটের জন্য দ্বিগুণ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার জন্য রাখা হয়। ভর্তির পর ৭ম এবং ৮ম শ্রেণিকে ফাউন্ডেশন লেভেল ধরা হয়। এই ফাউন্ডেশন লেভেলে কলেজের সমস্ত কর্মকাণ্ড যেগুলো তাদের কাছে নতুন সেগুলোর সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয় এবং ইংরেজির ভিত শক্ত করা হয়। উল্লেখ্য, ক্যাডেট কলেজের হাউসে (যেখানে অবস্থান করে) কোনো বাংলা পত্রিকা দেয়া হয় না, সবগুলো ইংরেজি পত্রিকা দেয়া হয়। বাধ্য হয়েই তাদের ইংরেজি চর্চা করতে হয়। এই নিয়মটিও আগে ছিল না।

www.pathagar.com

কেউ কেউ ভর্তি-প্রক্রিয়ার যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। একদল সুচতুর, বিচক্ষণ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর সমন্বয়ে প্রশ্নপত্র তৈরির জন্য বোর্ড গঠন করা হয়। তারা প্রশ্নপত্র তৈরি করেন। একই প্রশ্নপত্রে সকল কলেজের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

পরীক্ষা শেষে পরীক্ষার খাতা কোডিং করা হয়, যাতে পরীক্ষকগণ বুঝতে না পারেন কাদের খাতা। খাতায় কোনো প্রার্থীর নাম কিংবা রোল নম্বর থাকে না। এক কলেজের শিক্ষকগণ অন্য কলেজের খাতা পরীক্ষণ করে থাকেন। তারপর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করার সময় বোর্ডের চেয়ারম্যান (কোন এক কলেজের অধ্যক্ষ) বোর্ড শুরু হওয়ার এক ঘণ্টা পূর্বেও জানেন না উনি কোন বোর্ডে পরীক্ষা নিতে যাচ্ছেন। কেউ যদি বোর্ড সদস্যদের কিংবা বোর্ড চেয়ারম্যানকে প্রভাবিত করতে চান, তাহলে তাকে ১২ জন চেয়ারম্যানের সাথেই কথা বলতে হবে। বাস্তবে তা সম্ভব নয় আর তাই বলা যায়, ক্যাডেট কলেজের ভর্তি পরীক্ষায় যথেষ্ট স্বচ্ছতা বজায় রাখা হয়। এ নিয়ে কারো মনে কোনো সংশয় বা প্রশ্ন থাকার কথা নয়।

www.pathagar.com

ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক এবং তাদের পড়াশুনার চর্চা

৫ অক্টোবর আন্তর্জাতিক শিক্ষক দিবস হিসেবে পালিত হয় প্রতিবছর। এদিনে অনেক কথাই মনে পড়ে, অনেক কিছুই লেখার আছে। তবে আজকে আমার বিষয়টি শুধু ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকদের নিয়ে লেখা। সেপ্টেম্বর (২০১১) মাসের শেষ সপ্তাহে অফিসিয়াল কাজে উত্তর বঙ্গের বগুড়া ও রংপুর গিয়েছিলাম। ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি 'মেধাবিকাশ' নামে একটি প্রোগ্রাম পরিচালনা করে আসছে ২০০৫ সাল থেকে। এ প্রোগ্রামের আওতায় ব্র্যাক দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের একটি বৃত্তি প্রদান করে থাকে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা উচ্চ মাধ্যমিকে পড়াশুনার জন্য এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা উচ্চ শিক্ষার জন্য বৃত্তি পেয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ব্র্যাক এই কর্মসূচির আওতায় দুই হাজার ছত্রিশজনকে এই বৃত্তি প্রদান করেছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহ প্রদান করা, তারা পড়াশুনা কে কেমন করছে, তাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কী ইত্যাদি জানার জন্য তিন ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বগুড়া ও রংপুর ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে সভা করেছি। যেহেতু পূর্বে ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক ছিলাম তাই কোথাও গেলে আশপাশে কোন ক্যাডেট কলেজে কোন কোন শিক্ষক আছেন তা জানার চেষ্টা করি। রংপুর ক্যাডেট কলেজে খোঁজখবর নিয়ে জানতে পারলাম বর্তমান উপাধ্যক্ষ জনাব দেলোয়ার হোসেন। জনাব হোসেনের সঙ্গে একসঙ্গে কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজে একই সাথে চাকরি করেছি। একই বিল্ডিংয়ে ছিলাম, পারিবারিকভাবে তাদের সাথে সম্পর্ক। বরিশাল ক্যাডেট কলেজের সহকারী অধ্যাপক জনাব শওকত হোসেনের কাছ থেকে মোবাইল নম্বর নিয়ে ফোন দিলাম। দুজনই খুব উত্তেজিত যেহেতু অনেক দিন পর কথা তাই জনাব দেলোয়ার হোসেন খুব আন্তরিকতার সাথে বাসায় দাওয়াত দিলেন।

www.pathagar.com

ব্র্যাক অফিসে মিটিং শেষ করে সন্ধ্যা সাতটার দিকে রংপুর ক্যাডেট কলেজ ক্যাম্পাসে প্রবেশ করি। বাসায় পারিবারিক আলোচনার পর কলেজের বর্তমান অবস্থার কথা জানতে চাই। একই কথা শিক্ষকদের মান পূর্বের মতো নেই। একটু পরেই প্রেপ ক্লাস দেখার জন্য তার সাথে একাডেমিক ব্লকে যাই, সেখানে একজন ইংরেজি শিক্ষকের সাথে দেখা। তিনি নাম শুনে বললেন, হ্যাঁ আপনার নাম শুনেছি। আপনি এখন রাজউক কলেজে আছেন, তাই না? আমি আসলে ২০০৩ সালে রাজউক থেকে চাকরি ছেড়ে দিয়েছি। একটি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করি, তার পর পরই ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে চলে আসি এবং সেই ২০০৩ থেকে এখানেই আছি।

যেদিন রংপুর ক্যাডেট কলেজে প্রবেশে করি তার দুই দিন পূর্বে 'দ্যা ডেইলি সান' পত্রিকায় 'মুটিভেটিং টিচার্স' শিরোনামে আমার একটি আর্টিকেল বের হয়েছে, তারও সপ্তাহ খানেক পূর্বে বেরিয়েছে 'টিচার্স অ্যাজ লাইফলং লার্নাস'। ভেবেছিলাম কলেজে হয়তো পত্রিকা ডেইলি সান রাখে না, তাই হয়তো পড়ার সুয়োগ পাননি উক্ত শিক্ষক। কতক্ষণ ঘোরাঘুরির পর উপাধ্যক্ষ মহোদয় স্টাফ লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখলাম ডেইলি সান পেপার আছে। আমার প্রশ্ন ইংরেজি কিংবা বাংলা পত্রিকায় অনেক বিষয়ে অনেক লেখাই থাকে কিন্তু শিক্ষা সম্পর্কিত কোনো আর্টিকেল ইংরেজি শিক্ষকদের চোখ এড়িয়ে যাবে এবং যে পেপার তাদের কলেজেই আছে, এই ব্যাপারটি মেনে নিতে কেমন যেন লাগছিল। একটু পরে আরও একজন ইংরেজি শিক্ষকের সাথে দেখা, অবস্থা একই। মনে হচ্ছে ইংরেজি পত্রিকা তারা টাচ করেন না। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে পড়ে গেল, আমার অনেক বন্ধু সরকারি কলেজে শিক্ষকতা করছেন। এমফিল করার জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ছোটাছুটি করছেন। এই সময়ে খোঁজাখুঁজি শুরু করছেন কিছু ইংরেজি আর্টিকেল। আমার লেখালেখির কথা তারা ছাত্রজীবন থেকেই জানেন বলে জিজ্ঞেস করায় অনেকগুলোর উল্লেখ করলাম। তো একপর্যায়ে বললেন আসলে ইংরেজি পত্রিকা তো তেমন একটা পড়া হয় না, তাই হয়তো ওগুলো চোখে পড়েনি। ইংরেজি শিক্ষকগণ যদি ইংরেজি পত্রিকা না পড়েন তাহলে কারা পড়বেন? আমরা যখন ক্যাডেট কলেজে পড়িয়েছি, অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম কখন ইংরেজি পত্রিকা আসবে। পত্রিকা পেলে খুঁটে খুঁটে সব পড়তাম, শিক্ষা সম্পর্কিত আর্টিকেল হলে তো কথাই নেই। এ বিষয়টি বোধ হয় এখন আর নেই।

আমার নাম শুনেই আমাকে চিনতে হবে ব্যাপার সেটি নয়, আমার আগ্রহটা হচ্ছে শিক্ষকগণের আধুনিক পড়াশুনার সাথে কতটা সংশ্লিষ্টতা আছে তা জানা।

www.pathagar.com

শিক্ষকতার সাথে জড়িত নেই এমন অনেকেই ফোনে, মেইলে কিংবা ব্যক্তিগত সাক্ষাতের সময়ে অনেক সময়েই উল্লেখ করে বলে আপনার অমুক বাংলা আর্টিকেলটি পড়েছি, অমুক ইংরেজি আর্টিকেলটি পড়েছি অথচ খুব কমসংখ্যক শিক্ষকদের মুখে এ ধরনের কথা শোনা যায়। শিক্ষার যে বিভিন্ন ওয়েবসাইট আছে, সে নিয়েও দেখলাম তেমন কোনো খোঁজখবর বা আগ্রহ নেই শিক্ষকদের মাঝে। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষকগণ যেহেতু দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন তাদের জানাশোনা, পড়াশুনার চর্চা এবং আধুনিক জগৎ সম্পর্কে অবগতি অনেক বেশি থাকতে হবে সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়ানো শিক্ষকদের চেয়ে। সাধারণ স্কুল-কলেজে পড়াশুনা মানে শুধুই পড়াশুনা, কোনো ধরনের এক্সট্রা কারিকুলার কার্যাবলি নেই, থাকলেও নামমাত্র, সামরিক প্রশিক্ষণ নেই, প্যারেড পিটি নেই। কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীদেরকে সব ধরনের কার্যাবলিতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে হয়। সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে হয়, খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করতে হয় নিয়মিত। অতএব একজন ক্যাডেট কলেজ শিক্ষককে সত্যিকার অর্থেই অলরাউন্ডার হতে হয়। ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষ আশা করি বিষয়টির প্রতি আরও দৃষ্টি দিবেন।

ক্যাডেটদের হাউসে নাকি বর্তমানে শুধু ইংরেজি পত্রিকা দেওয়া হয়। এটি একটি ভালো উদ্যোগ, তবে বাংলা পত্রিকাও দেওয়া উচিত বলে মনে হয় এবং ইংরেজি পত্রিকা ক্যাডেটরা কতটা পড়ছেন তা নিশ্চিত করার জন্যও কোনো শিক্ষককে দায়িত্ব দেয়া যেতে পারে। তা না হলে হাউসে ইংরেজি পত্রিকা দেওয়া হয়, ক্যাডেটরা যদি শুধু নাড়াচাড়া করে চলে আসে, তেমন কিছু না পড়ে, তাহলে লাভ কী? ছুটিতে আসা ঢাকায় জুনিয়র ক্যাডেটদের জিজ্ঞেস করেছিলাম, হাউসে ইংরেজি পত্রিকা পড়ে কি না। তারা উত্তর দিল আমরা পড়তে পারি না সিনিয়র ক্যাডেটদের জন্য। তারা পড়ার সময় আমরা পড়তে পারি না, তাদের পড়া শেষ হলে পেপার তারা রুমে নিয়ে যায় ফলে আমরা আর পাই না। সংখ্যাও নাকি অপ্রতুল। দুটি বা তিনটি ইংরেজি পত্রিকা রাখা হয় হাইসে। এখানে প্রাক্তন ক্যাডেট কলেজের শিক্ষক হিসেবে এবং এখনও ক্যাডেট কলেজের প্রতি আগ্রহ আছে বিধায় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করছি বাংলাদেশে প্রচলিত সব কটি ইংরেজি দৈনিক ক্যাডেট কলেজের হাইসে এবং স্টাফ লাউঞ্জে যাতে রাখা হয়। বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য ছাড়াও প্রচুর শিখন ম্যাটেরিয়ালস পত্রিকায় থাকে। এক দুটো পত্রিকা রাখলে সে বিষয়টি কাভার হয় না। আর একটি বিষয় যারাই ইংরেজি পত্রিকা পড়েন, তাদেরকে জিজ্ঞেস করেছি কোনটি পড়েন, সবার একই উত্তর 'ডেইলি স্টার'। আমার প্রশ্ন ডেইলি স্টারেই কি আমরা যা চাই তা সবকিছু থাকে?

www.pathagar.com

আমার মনে আছে, কুমিল্লা ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ জনাব মাসুদ হাসান খুব আগ্রহ নিয়ে ক্যাডেটদের সাথে ইংরেজি পত্রিকার বিভিন্ন আর্টিকেল নিয়ে, আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করতেন। সপ্তাহে একদিন দুই থেকে তিন ঘণ্টা ক্যাডেটদের সাথে বসতেন এ বিষয়টি নিয়ে। রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার একদিন আগেও এই কাজটি তিনি করেছিলেন, অসমাপ্ত অংশ আমাদের ইংরেজি শিক্ষকদের দিয়ে এসেছিলেন। ক্যাডেট কলেজে বর্তমানে এ ধরনের কোনো উদ্যোগ নেওয়া হয় কি না জানি না। ইংরেজি ক্লাবে ইংরেজি পত্রিকা নিয়ে প্রচুর কাজ হতো, সেটিও বোধ হয় এখন আর নেই। শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণে প্রেরণ করা না হলে তাদের এক্সপোজার কম হবে, ক্যাডেটরা কম উপকৃত হবে। ক্যাডেট কলেজের চাকরিকে আরও আকর্ষণীয় করার নিমিত্তে শিক্ষকদের দেশে-বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা উদার ও জোরদার করা দরকার। সর্বোপরি সব কটি ক্যাডেট কলেজের প্রাক্তন শিক্ষক ও ক্যাডেটদের নিয়ে কোনো অর্গানাইজেশন করা যায় কিনা বিষয়টি ভেবে দেখার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি অনুরোধ রইল।

www.pathagar.com

কোচিং সেন্টারগুলো কি ইংরেজি শেখাতে পারে?

স্কুল ও কলেজেই ইংরেজি ভাষা শেখানোর শিক্ষক নেই অনন্য ব্যতিক্রম ছাড়া। ভাষা শেখানোর মতো প্রশিক্ষিত ও দক্ষ শিক্ষক আমরা আসলে তৈরি করতে পারিনি অথচ ইংরেজির গুরুত্ব দিন দিন বেড়ে যাওয়ায় ব্যক্তিগত ও বেসরকারি পর্যায়ে শুরু হয়েছে ইংরেজি শেখানোর বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রচেষ্টা। কে কতটা সফল এবং বাস্তবমুখী, তার নেই কোনো সঠিক পরিসংখ্যান এবং গবেষণা। বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমে নিজেরাই প্রচার করে নিজেদের সাফল্যের কথা।

আমি দু-একটি অনুষ্ঠান টিভির পর্দায় দেখেছি। শিক্ষক নিজে পুরো কথাটাই বাংলায় বলছেন। বাংলা মাধ্যমে যেভাবে ইংরেজি শেখানোর প্রচেষ্টা চলছে, তাতে তো ইংরেজি শেখানো হচ্ছে না হয়তো 'বাংরেজি' কিছুটা হচ্ছে। ভাষা শেখানোর জন্য দরকার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, গবেষণা, প্রচুর পড়াশোনা ও একাগ্রতা। এই বিষয়গুলো আমাদের স্কুল ও কলেজেই যেহেতু নেই, প্রশ্ন জাগে তাহলে এসব জায়গায় কারা পড়ান ইংরেজি।

ছাত্রজীবনে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি শেখার জন্য ইংরেজি পড়েনি পরীক্ষায় পাস করার জন্য পড়েছে। পরীক্ষায় পাস করে এসেছে কিন্তু ইংরেজি শেখা হয়নি। বাস্তবজীবনে এসে যখন দেখল তাদের ইংরেজি পড়া এবং বাস্তবজীবনে ইংরেজি ব্যবহারের মধ্যে অনেক তফাৎ, তখনই তারা আবার এই ভাষা শেখার জন্য লেগে যায়। এই সময় যেহেতু স্কুল ও কলেজে আর যাওয়া যায় না তাই তারা বিকল্প খোঁজে আর এই বিকল্প জায়গাই দখল করেছে কোচিং সেন্টারগুলো।

বিভিন্ন বিজ্ঞাপন ও প্রচার দেখে মনে হয় এই কোচিংগুলোর ব্যবসা রমরমা। আর দেখা দিয়েছে প্রতিযোগিতা বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের মধ্যে। অনেক স্কুল-কলেজের শিক্ষকরাও জড়িয়ে পড়েছেন এখানে শিক্ষাদান করাতে। তাদের প্রতিষ্ঠানে তারা

www.pathagar.com

ব্যর্থ হয়েছেন ইংরেজি শেখাতে, এখানে আসছেন ব্যবসা জমাতে, ইংরেজি শেখাতে নয়।

এসব কোচিংয়ে যেসব চাকরিজীবীরা ইংরেজি শিখতে যান, তাদের মনে রাখতে হবে যে হাতুড়ে ডাক্তার দ্বারা যেমন কোনো চিকিৎসা হয় না বরং রোগ বেড়ে যাওয়া বা বিপজ্জনক দিকে টার্ন করানোর সম্ভাবনা থাকে বেশি। ঠিক একইভাবে তথাকথিত কোচিং সেন্টারগুলোতে দক্ষ ও প্রশিক্ষিত কোনো শিক্ষক নেই। একটি বিদেশি ভাষা পড়ানো বা শেখানো চাট্টিখানি কথা নয়। এজন্য দরকার অগাধ পড়াশোনা, গবেষণা এবং সঠিক পরিবেশ এবং সঠিক প্রশিক্ষণ। এর কোনোটিই এসব কোচিং সেন্টারের শিক্ষক কিংবা শিক্ষক নামধারী ছাত্রদের নেই। বিশাল বিশাল সাইনবোর্ড টানিয়ে এবং পত্রিকার পাতা ভর্তি করে বিজ্ঞাপন দিয়ে চলছে এদের রমরমা ব্যবসা। সরকার বা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না. কারণ এসব জায়গায় অন্তত কিছু লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে তাই। তাছাড়া ভুল হোক বা ভাঙাচোরা যাইহোক কিছু ইংরেজির চর্চা তো হচ্ছে বলে মনে করেন কর্তৃপক্ষ।

স্কুলে যখন পড়তাম, তখন ভাবতাম, যে যত বেশি কঠিন ভয়েস চেইঞ্জ করতে এবং উক্তি পরিবর্তন করতে পারে, সে তত ভালো ইংরেজি জানে বা ভালো ইংরেজি শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ইংরেজি অনার্সে ভর্তি হলাম, দেখলাম ব্যাপারটি পুরো আলাদা। ক্যাডেট কলেজসহ বিভিন্ন কলেজে ইংরেজি পড়াতে গিয়ে অনেক কিছু টের পেলাম। আবার যখন ইএলটির প্রশিক্ষণ নিলাম, তখন দেখলাম ভাষা সম্পর্কে সেটি আবার আর এক জগৎ। কোচিং সেন্টারগুলোতে কারা পড়াচ্ছেন ইংরেজি? কলেজ পর্যায়েই নেই ভাষা পড়ানোর মতো শিক্ষক। বেকার কিছু ছাত্র-ছাত্রী কিংবা স্কুলের পুরনো ধ্যানধারণার কিছু শিক্ষক ইংরেজি পড়াচ্ছেন কোচিং সেন্টারগুলোতে। আর স্কুল পর্যায়ের কিছু তথাকথিত নামকরা শিক্ষক যাদের ভাষা শেখানো সম্পর্কে তেমন কোনো ধারণা নেই, তারা পড়াচ্ছেন ইংরেজি। এসব শিক্ষক জানেন না ছাত্র-ছাত্রীদের কিংবা বয়স্ক শিক্ষার্থীদের কীভাবে আধুনিক পদ্ধতিতে ইংরেজি পড়াতে হয়। তারা শুধু জানেন, কীভাবে কঠিন কঠিন গ্রামারের নিয়ম পড়ানো যায়। কীভাবে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করা যায়, কীভাবে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইংরেজি লেখার ও বলার অভ্যাস করাতে হবে, তা তারা জানেন না বা অভ্যাস করান না।

কোচিং সেন্টারে যারা ইংরেজি পড়ান, আমি তাদের কয়েকজনকে প্রশ্ন করেছি তারা কোন কোন ইংরেজি পত্রিকা পড়েন। অবাক কাণ্ড, তাদের কেউ ইংরেজি

www.pathagar.com

পত্রিকা পড়েন না। অথচ ইংরেজি শেখার জন্য ইংরেজি পত্রিকা পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য একান্ত প্রয়োজন এবং এটি একটি সঠিক লার্নিং ম্যাটেরিয়াল।

ইংরেজি ভাষার চারটি (skills) দক্ষতার মধ্যে মাত্র দুটো দক্ষতার পরীক্ষা হয় আমাদের পাবলিক পরীক্ষাগুলোতে এবং তার উপরই আমরা ছাত্র-ছাত্রীদের গ্রেডিং করে থাকি এবং সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকি যে সে ইংরেজিতে খুবই ভালো। ইংরেজিতে এ প্লাস (এ+) পাওয়া মানে ৮০% কিংবা তার বেশি মার্কস পাওয়া অর্থাৎ এ প্লাসধারী একজন ছাত্র বা ছাত্র ইংরেজিতে খুবই ভালো। সে ইংরেজিতে কথা বলতে পারবে, তার জানা যেকোনো বিষয়ে লিখতে পারবে, ইংরেজি শুনে বুঝতে পারবে এবং ইংরেজিতে লেখা যেকোনো বিষয় বুঝতে পারবে। কিন্তু আমাদের এ প্লাস পাওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অবস্থান কোথায় তা পাঠকই বিবেচনা করবেন। কোচিং সেন্টারগুলোতে যদি বাকি দুটো দক্ষতার উপর কোনো ধরনের গুরুত্বারোপ করা হতো কিংবা সঠিক কোনো ব্যবস্থা নেয়া হতো তাহলে বুঝতাম যে, তারা কিছু একটা করছে। তা তো না, তারা সিলেবাস অনুযায়ী একই ধারায় এগুচ্ছে। ইংরেজির আন্তর্জাতিক টেস্টিং সিস্টেম ও সার্ভিসগুলো (IELTS, TOEFL) চারটি দক্ষতার উপরই পরীক্ষা নেয় এবং সে অনুযায়ী গ্রেডিং করে থাকে।

ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকরা কোচিংয়ের শরণাপন্ন হন, কারণ স্কুল কিংবা কলেজে একই ক্লাসে অনেক ছাত্র-ছাত্রী থাকে বলে দুর্বল এবং অধিক মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী গুরুত্ব পায় না। তারা মনে করে, বিশেষ কোনো কোচিংয়ে গেলে তারা উপযুক্ত গুরুত্ব পাবে। কিন্তু এখানে অবস্থা তো আরও খারাপ। স্কুলে শিক্ষকগণ অন্তত সিলেবাস নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাদের, যদিও আধুনিকতার ছোঁয়া তেমন একটা নেই। কোচিংয়ে কি হয়, একই বিষয় চেপে ধরে বারবার মুখস্থ করানো হয় আর বারবার পরীক্ষা নেয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বিষয়টি মোটেই আকর্ষণীয় নয় এবং এই বিষয়টি একেবারেই সৃজনশীল নয়। সৃজনশীল না হলে এই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে স্থান করে নেয়া খুবই কঠিন। দেখা যায়, অনেক ছাত্র-ছাত্রী অনেক ভালো ফলাফল করেও ভালো প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারে না কিংবা ভালো প্রতিষ্ঠানে চাকরি পায় না, কয়েকটি কারণের মধ্যে সৃজনশীলতার অভাব একটি। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের কোচিংমুখী না করে বাসায় পড়ানো, নিজেরা একটু সময় দেয়া, ইংরেজি ও বাংলা পত্র-পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলানো উচিত। আর চাকরিজীবী যারা ইংরেজি শিখতে কোচিং সেন্টারে যান, তারা নিজেরা নিয়মিত ইংরেজি পত্রিকা পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলুন, ভালো কোনো শিক্ষকের সংস্পর্শে থাকুন এবং ইংরেজি খবর

www.pathagar.com

শোনার ও মুভি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলুন, দেখবেন আপনার অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হবে। কোচিংয়ে আপনারা যাদের কাছে ইংরেজি পড়েন, তারা নিজেরাই ইংরেজি পত্রিকার খবর রাখেন না, অথচ এসব পত্র-পত্রিকায় প্রচুর ম্যাটেরিয়ালস ও গাইডলাইন থাকে, যা ইংরেজি শেখার জন্য যথেষ্ট সহায়ক এবং কার্যকরী।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. আশরাফুল ইসলাম কোচিং সেন্টার সম্পর্কে বলেন, "কোচিং সেন্টারগুলো ইংরেজি ভাষার দৈন্যদশা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সেন্টারগুলো পরীক্ষা পাসের জন্য কিংবা বেশি নম্বর পাওয়ার জন্য সংক্ষিপ্ত পথ দেখিয়ে দেয়, যা ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।" প্রফেসর সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, "আমি একদিন কোনো এক কোচিং সেন্টারের পরিচালককে ইংরেজি ক্লাস নিতে দেখলাম। ঐ একটি ক্লাসের মধ্যে সে সাতটি ভুল ইংরেজি শিখিয়েছে।" মিরপুর বাংলা হাইস্কুলের একজন শিক্ষার্থী বলছে, "স্কুলে আমাদের ইংরেজি শিক্ষক আমাদের নিয়ে মজা করেন। ইংরেজি ক্লাস আদৌ আকর্ষণীয় নয়, বরং ভীষণ বোরিং। শুধু ধরাবাঁধা কিছু গ্রামারের নিয়ম দিনের পর দিন পড়ান, যা শিক্ষার্থীদের একেবারেই আকর্ষণ করে না। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিংয়ে ভর্তি হয়, কিন্তু এখানকার অবস্থাও একই। কোথায় যাব আমরা সঠিক ও আকর্ষণীয় উপায়ে ইংরেজি শিখতে?" এই প্রশ্ন শুধু একজন ছাত্রের নয়, এ প্রশ্ন অগণিত ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবকের। কে দিবে এর উত্তর?

www.pathagar.com

ইংরেজি মাধ্যম এবং আন্তর্জাতিক ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের লেখাপড়া

বাংলাদেশে বর্তমানে ২০ ধরনের আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় আছে। অভিভাবকগণ স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় বাদ দিয়ে তাদের সন্তানদের এসব আন্তর্জাতিক ইংলিশ মাধ্যমে পাঠাচ্ছেন কেন? প্রথমত, এখানকার শিক্ষকগণ স্থানীয় ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের চেয়ে অনেক বেশি মানসম্পন্ন। তাছাড়া এসব স্কুলের কারিকুলাম ও কোর্সসমূহ বিদেশি শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত হয়, ব্যবস্থাপনাও বিদেশিদের। বিদেশিদের ব্যবস্থাপনা মানে দক্ষ ব্যবস্থাপনা বলে ধরে নেওয়া হয়। দ্বিতীয়ত, বাস্তবজীবনে সমস্যাবলি কীভাবে সমাধান করা যায়, এসব স্কুলে সেগুলো শেখানো হয় অর্থাৎ এখানকার শিক্ষা অনেকটাই বাস্তবমুখী। শিক্ষার্থীরা এখানে গণিত ও প্রকৌশলগত দক্ষতাও অর্জন করে। দলে ও জুটিতে কাজ করে কীভাবে বাস্তবজীবনের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো অর্জন করা যায়, সে শিক্ষা তারা এসব প্রতিষ্ঠান থেকে পেয়ে থাকে। তারা আরও শিখে কোনো একটি ব্যাপার বা বিষয়কে কীভাবে জটিলভাবে ও সৃজনশীল উপায়ে চিন্তা করতে হয়। দেশে-বিদেশে চাকরি করে এখানকার গ্রাজুয়েটগণ ইতিমধ্যে সুনাম অর্জন করেছে।

তাদের যোগাযোগ দক্ষতা, ব্যবস্থাপনা প্রশংসনীয়। তাছাড়া এসব স্কুল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা উত্তর আমেরিকা, যুক্তরাজ্য এবং অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সহজেই ভর্তি হতে পারে। এসব স্কুলে যারা পড়ে তারা বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের শিক্ষার্থীদের সাথে যোগাযোগ ও মেলামেশার সুযোগ পায়। বড় হয়ে বাস্তব জীবনে অন্যের সাথে কীভাবে মিশতে হয় তা জানার সুযোগ পায়। এসব কারণে স্কুলে পড়ার খরচ অন্যান্য ইংরেজি মাধ্যমের চেয়ে বেশি তারপরও অভিভাবকগণ এখানে তাদের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। এখানকার শিক্ষার্থীরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো টিচিং অ্যাসিসট্যান্টশিপ পেয়ে থাকে। সমস্যা

www.pathagar.com

বিশ্লেষণ করার ও গ্রুপ আলোচনা করার সুযোগ পায়। আর একটি বড় ব্যাপার হচ্ছে অভিভাবকদের প্রাইভেট পড়ানোর চিন্তা করতে হয় না। অভিভাবকদেরকে শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকদের বাসায় বাসায় যেতে হয় না, যা দেশি ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম এবং ইংরেজি ভার্সনের ক্ষেত্রে করতে হয়। ট্রাফিক জামে আটকে থাকার চিন্তা করতে হয় না। এসব বিদ্যালয়গুলো হচ্ছে–কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক এসব ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো থেকে বিভিন্ন ধরনের ডিগ্রি দেওয়া হয়ে থাকে। অর্ডিনারি ও অ্যাডভান্সড লেভেল, জুনিয়র ও সিনিয়র ক্যামব্রিজ, আমেরিকান হাইস্কুল ডিপ্লোমা, অস্ট্রেলিয়ান হায়ার স্কুল সার্টিফিকেট, আন্তর্জাতিক ব্যাকালরেট ইত্যাদি। এসব ডিগ্রি নেয়ার পর একজন শিক্ষার্থী উত্তর আমেরিকার, অস্ট্রেলিয়া ও গ্রেট ব্রিটেনের বিশ্ববিদ্যায়গুলোতে ভর্তির সুযোগ পায়। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন এসব ডিগ্রিকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না। ফলে এসব স্কুল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের পাবলিক কিংবা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ভর্তি হতে পারছে না। সবাই যে বিদেশে যাচ্ছে বা যেতে পারছে, তারও কোনো সঠিক পরিসংখ্যান নেই। অভিভাবকগণও এসব বিষয়ে খুব একটা সচেতন নন। ইউজিসির বিষয়টি নিয়ে ভেবে দেখা দরকার। ইউজিসির এসব ডিগ্রি গ্রহণ করার অর্থ হচ্ছে এসব স্কুল থেকে পাস করা শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশের উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে ভর্তির সুযোগ পাবে, দেশও তাদের সেবা পাবে, বাঁচবে বহু দেশি মুদ্রা।

এগুলো ছাড়াও আমাদের রয়েছে দেশি অসংখ্য ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। এগুলো নিয়ে বেশ কিছু নেতিবাচক কথাবার্তাও প্রচলিত আছে। এখানকার শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সালাম বা আদাব দেওয়ার তোয়াক্কা করে না। ক্লাসে যেকোনো সময়, প্রথম পিরিয়ড শেষেও ক্লাসে ঢুকতে পারে, তবে তাদের কিছু বলা যাবে না, কারণ কোনো ধরনের শাস্তি এখানে প্রযোজ্য নয়। তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা মোটামুটি ফিটফাট পোশাক পরে, তৃতীয় গ্রেডের পর তাদের ড্রেস নিচে নামতে থাকে অর্থাৎ অশালীনভাবে পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। আমাদের দেশীয় কালচারের সাথে যা বেমানান। এসব বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তির কোনো বিধান নেই। কোনো কোনো শিক্ষক বলেন, শারীরিক শাস্তি দেয়ার দরকার নেই, শারীরিক শাস্তির ভয় তাদের অনেক কিছু শেখাত। যাই হোক এটি একটি বিতর্কিত বিষয়। তবে এটি সত্য যে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অনেকটাই উগ্র এবং আমাদের সংস্কৃতির সাথে খাপ খায়না এমন অনেক আচরণই করে থাকে। আবার এও সত্য যে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে শিক্ষার্থীরা আনন্দের মধ্যে

www.pathagar.com

দিয়ে শেখে। কিন্তু স্কুলে তো শুধু পড়ালেখা শেখাই উদ্দেশ্য নয়। তারা কাস্টম, ব্যবহার, কালচার, মানবিক আচরণ ও ব্যবহার স্কুলে শিখবে। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলো এসব কিছুর তোয়াক্কা করে না। তারা সব সময়েই চেষ্টা করে কীভাবে অন্যের চেয়ে স্মার্ট হওয়া যায়। আর এই স্মার্টের পেছনে ছুটছে সব গার্ডিয়ান ও শিক্ষার্থীগণ। তবে সবাই যে শুধু সন্তানদের স্মার্ট বানানোর জন্যই ইংরেজি মাধ্যমে পাঠাচ্ছে তা নয়। বাংলা মাধ্যম বা ইংরেজি ভার্সনের অবস্থা যে খুব ভালো তা তো নয়। এসব স্কুলের লেখাপড়া এখনও আধুনিকতা থেকে অনেক দূরে। এখানে ক্রিয়েটিভি এবং উদ্ভানীর চর্চা বা অভ্যাস নেই বললেই চলে। পড়া গিলা, খাতায় ঢেলে দেওয়া আর গ্রেড অর্জন করাই মুখ্য। শিক্ষার্থীরা কি শিখলো বা তাদের বাস্তব জীবনে এগুলো কতটা কাজে লাগবে তার কোনো চেষ্টা বা চিন্তা নেই। কাজেই সচেতন এবং সচ্ছল অভিভাবকগণ তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠাচ্ছেন। এ ছাড়াও বাংলা মাধ্যমে হাতেগোনা কয়েকটি বিদ্যালয় আছে, সেগুলোতে ভর্তি করানোর চেষ্টা করা মানে এক পাগলামির মতো যুদ্ধ করা। এই যুদ্ধ এড়াতে এবং কোচিং এড়াতে অনেক অসচ্ছল অভিভাবকগণও তাদের সন্তানদের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে পাঠিয়ে থাকেন। আন্তর্জাতিক ইংরেজি মাধ্যম তো হলো একেবারে উচ্চবিত্তের খেলা কিন্তু ইংরেজি মাধ্যমে তো তা নয়। অথচ ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য সরকারের তরফ থেকে তেমন কোনো প্রশংসীয় উদ্যোগ বা চেষ্টা নেই। ইংরেজি মাধ্যমের ছাত্র-ছাত্রীরা জাস্টিন বুইবেন বা অ্যাকর্নের গান শোনে, তারা রুনা লায়লা, সাবিনা ইয়াসমীন এবং লালনগীতি জানে না, জানে না মমতাজ কে। ইংরেজি মাধ্যমের একটি ছেলে বা মেয়েকে শুধু ইংরেজি বলতে পারা এবং উপস্থাপন দক্ষতা ছাড়া প্রশংসা করার মতো তেমন আর কিছু নেই। তারপরও তারা যে শুদ্ধ ইংরেজি বলছে, তা কিন্তু নয়। তারা আমাদের নিজস্ব কালচার সম্পর্কে অজ্ঞ, আমাদের সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না বা শ্রদ্ধা দেখায় না। শিক্ষার যে মূল উদ্দেশ্য তা কিন্তু এখানে হচ্ছে না।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের দেশের অভিভাবকগণ কেন ছেলেমেয়েদের ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে পাঠাচ্ছেন? এর কয়েকটি কারণ আছে। একটি হচ্ছে আধুনিক যুগ ইংরেজি ও কম্পিউটারের যুগ, ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলো এই চাহিদা পূরণ করছে বলে অনেক অভিভাবক এখানে তাদের ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে থাকেন। দ্বিতীয়ত, বাংলা মাধ্যমে হাতেগোন দু-একটি বিদ্যালয় ছাড়া বাকিগুলোর শিক্ষার পরিবেশ ও মান ভালো নয়। জনসংখ্যার অনুপাতে ঢাকা শহরে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নিতান্তই অপ্রতুল। আর হাতেগোনা নামীদামি কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া এক ধরনের পাগলামীর মতো পরীক্ষা এবং প্রতিযোগিতা।

www.pathagar.com

কিছু অর্থনৈতিকভাবে বেশ সচ্ছল অভিভাবকগণ টাকা খরচ করা এবং ইংরেজি মাধ্যমে বাচ্চা পড়ানো এক ধরনের প্রেস্টিজ মনে করেন। ইংরেজি মাধ্যমের পড়ালেখার ধরন ও পরীক্ষাপদ্ধতি শিক্ষার্থীদেরকে সৃজনশীল হতে বাধ্য করে, যা বাংলা মাধ্যমে প্রায় পুরোটাই অনুপস্থিত। এসব কারণের জন্য ইংরেজি মাধ্যমের লেখাপড়া এবং বিদ্যালয়ের সংখ্যা দিন দিনই বেড়ে যাচ্ছে আর তা ছড়িয়ে পড়ছে সিটি থেকে শহর, শহর থেকে উপজেলা এমনকি গ্রামেও। কাজেই সময় এসেছে এসব বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা এবং দেশীয় কালচারের সাথে মিল রেখে বাস্তবমুখী শিক্ষাদান করার সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষায় হতাশা এবং আশা

আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া, শিক্ষার গুণ ও মান, শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে না পারা এবং নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষাদান ইত্যাদি বিষয়গুলো বিদ্যমান এবং প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতির ক্ষেত্রে এগুলো বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ প্রাথমিক শিক্ষাই সকল শিক্ষার ভিত্তি। আমরা যদি এই ভিত্তিকে মজবুত করে গড়ে তুলতে না পারি, তাহলে উচ্চশিক্ষা এবং দেশ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নাগরিক ও নেতা তৈরি হবে না। প্রাথমিক শিক্ষার সমস্যাবলির জন্য আমরা জাতীয় ক্ষেত্রে যে অনেক পিছিয়ে আছি তা আর নতুন করে প্রমাণ করার প্রয়োজন নেই।

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়ার চিত্র আশাব্যঞ্জক তো নয়ই বরং হতাশাজনক। একটি জাতীয় দৈনিকের এক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০০৮ সালে ৩৭ লাখের বেশি শিশু প্রথম শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিল। তাদের মধ্যে ২৬ লাখের কিছু বেশি শিক্ষার্থী চলতি বছর পঞ্চম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার জন্য নিবন্ধন করেছে অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণিতে আসা পর্যন্ত সাড়ে ১১ লাখ শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। কিছু শিক্ষার্থী অন্য ধারায় হয়তো চলে গেছে, কেউ হয়তো ফেল করার কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত আসতে পারেনি তারপরেও প্রকৃত ঝরে পড়ার হার আঁতকে ওঠার মতো। অপুষ্টি, দারিদ্র্য, পাঠ্যপুস্তক পাঠদান চিত্তাকর্ষক নয়, ভর্তির পর স্কুল পরিবর্তন, অভিভাবকদের অসচেতনতা ইত্যাদি কারণগুলোকে দায়ী করেছে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ। ২০০৯ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে ওঠার পর্যায়ে তাদের মধ্যে ছয় লাখের বেশি শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে। ২০১০ সালে তৃতীয়, ২০১১ সালে চতুর্থ পর্যায় পেরিয়ে ২০১২ সালে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ৩৮ হাজার ৪৫৪ জন, যদিও ভর্তি হয়েছিল ৩৭ লাখ ৭৯ হাজার ২১১ জন অর্থৎ ঝরে পড়েছে ১১ লাখ ৫০ হাজার ৭৫৭ জন। (কালের কণ্ঠ ২৪.৮.২০১২)।

www.pathagar.com

প্রাথমিক শিক্ষায় ঝরে পড়া রোধ করতে হলে বহু ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন আর এই পদক্ষেপ সরকারের একার পক্ষে নেওয়া সম্ভব নয়, তবে বিশাল দায়িত্বটি সরকারকেই বহন করতে হবে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের মহপরিচালক শ্যামল কান্তি বলেন, ঝরে পড়া রোধকল্পে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি বাড়ানো হয়েছে, স্কুলে বিস্কুট দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এই পদক্ষেপগুলো কী পরিমাণে কোথায় কার্যকরী হচ্ছে এবং যেসব এলাকায় এগুলো বেশি দরকার সেসব এলাকায় ঠিকভাবে হচ্ছে কি না, তার সঠিক কোনো পর্যবেক্ষণ বা গবেষণা নেই। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব এম এম নিয়াজ বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ শিক্ষার্থী আসে দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে তাদের মধ্যে ৫৫ শতাংশ গুরুতর অপুষ্টির শিকার, ৫৬ শতাংশ প্রয়োজনের তুলনায় কম ওজনের। ফলে দীর্ঘক্ষণ ক্লাসে থাকা এবং পড়াশুনায় মনোযোগ দেওয়া তদের জন্য সম্ভব হয় না। এটি একটি বিরাট সমস্যা প্রাথমিক শিক্ষা ক্ষেত্রে। সরকারের একার পক্ষে এই বিশাল সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয়, বেসরকারি এবং কমিউনিটির যৌথ প্রয়াস ও উদ্যোগ প্রয়োজন। তবে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে পুরো বিষয়টি সমন্বয় করার জন্য। প্রথমেই সরকার বিশাল পরিমাণ লোকসান গুনছে অনেক প্রতিষ্ঠানে, সেগুলোর লোকসান কমিয়ে আনতে পারলে এখানে বরাদ্দ বাড়ানো যেত। পুরো দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে এমনভাবে ভাগ করতে হবে যাতে সরকার, বেসরকারি সংস্থা এবং অন্যান্য (কমিউনিটি, বিদেশি কোন সংস্থা ইত্যাদি) প্রাথমিক শিক্ষার দেখভাল সুনির্দিষ্টভাবে করতে পারে। কোনো কোনো এলাকায় সরকারি প্রচেষ্টা পৌছাবে না, সেখানে এনজিওগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া, সেখানে এনজিওর খুব একটা গ্রহণযোগ্যতা নেই বা প্রয়োজনীয়তা নেই, সরকারও সাফল্যজনকভাবে এগুতে পারছে না অথচ শিশুরা বঞ্চিত হচ্ছে, তাদের অধিকার প্রাথমিক শিক্ষা থেকে সেখানে কমিউনিটিকে কীভাবে সহায়তা দিলে অবস্থার উন্নতি হবে, সে বিষয়গুলো সরকারকেই বের করতে হবে।

সাম্প্রতিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে বড় ধরনের এক জটিলতা তৈরি হয়েছে। গত জুলাই মাসে ১২ হাজার প্রার্থীকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল কিন্তু এ নিয়োগপ্রক্রিয়া শেষ না হতেই নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নিয়ে শূন্য পদে নিয়োগ দেওয়ার পাশাপাশি আরো ২০ হাজার জনকে নিয়ে শিক্ষক পুল গঠন করার সিদ্ধান্ত হয়। এই পুল গঠনের উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে গিয়ে নিয়োগপ্রক্রিয়া বিলম্বিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের আদেশে বলা হয়েছে যে,

www.pathagar.com

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের সমন্বয়ে ২০ হাজার জনের পুল গঠন করা হবে। পুলের শিক্ষকরা মাসোহারা ভিত্তিতে ছয় মাসের জন্য নিয়োগ পাবেন। প্রকৃত দায়িত্বে নিয়োগ হলে পুলের শিক্ষকরা ১০ শতাংশ লিভ রিজার্ভ কোটায় নিয়মিত চাকরি পাবেন। যেসব জেলায় এই লিভ রিজার্ভ কোটা পূরণ হয়ে যাবে সেসব জেলায় পুলে বিলুপ্তি ঘটবে।

প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক পুল গঠন করা একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ কারণ বিভিন্ন কারণে শিক্ষকগণ নিয়মিত ক্লাস পরিচালনা করতে পারেন না। প্রশিক্ষণ ও মাতৃকালীন ছুটির কারণে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শূন্যতা তৈরি হয়। আর প্রশিক্ষণ একটি অতিপ্রয়োজনীয় ব্যাপার শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে পাঠাতে অনাগ্রহ প্রকাশ করে কারণ দুই-একজন শিক্ষক প্রশিক্ষণে থাকলে প্রতিষ্ঠান ঠিকমত ক্লাস ম্যানেজ করতে পারে না। তাছাড়া শিক্ষকদের মাতৃত্বজনিত ছুটি, বিশেষ ছুটি, অসুস্থতাজনিত ছুটি ইত্যাদি কারণে শিক্ষক স্বল্পতাহেতু অনেক ক্লাস বাদ যায়। এসব ক্লাস পরিচালনার জন্য পুলের শিক্ষকদের কাজে লাগানো হবে। এটি ছয় মাসের জন্য প্রযোজ্য হবে। ছয় মাস পর কি শিক্ষকদের ঘাটতি থাকবে না? তখন কীভাবে শূন্য পদ পূরণ করা হবে? আদেশে বলা হয়েছে পুলের শিক্ষকদের মধ্যে প্রকৃত দায়িত্বে নিয়োজিতরা চাকরিতে নিয়মিত হবেন। কিন্তু পদ শূন্য না থাকলে কীভাবে তাদের নিয়মিত করা হবে? পুলের শিক্ষকদের প্রকৃত দায়িত্বই বা কি– সে প্রশ্নেরও সঠিক উত্তর নেই। নিয়মিতকরণে কোন বিধি অনুসরণ করা হবে তারও কোনো উত্তর নেই। বলা হয়েছে, ১০ শতাংশ লিভ রিজার্ভ নিয়োগে নিয়মিত করা হবে। তাহলে পুলের কী হবে? শিক্ষক পুল গঠনের কারণে শূন্য পদেই নিয়োগ শেষ করা যাচ্ছে না। এখন অবার পুল গঠন করা হবে। সব মিলিয়ে যে জটিলতা তৈবি হয়েছে তা নিরসন করা সহজ হবে না। শিক্ষক পুল তৈরি বিষয়টি আসলে একটি কার্যকরী এবং সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এলাকার শিক্ষিত বেকার যুবক ও ছাত্র-ছাত্রীদের এ পুলে অন্তর্ভুক্ত করা হলে সবার জন্যই মঙ্গলজনক হবে।

তবে এতসব সমস্যার মধ্যেও খুশির সংবাদ হচ্ছে, সরকার দেশের ২৬ হাজার ২৮৪টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন ধাপে জাতীয়করণ করতে যাচ্ছে। প্রথম ধাপ শুরু হবে ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে তখন ১০৫৩৪৫ জন শিক্ষকের চাকরিও জাতীয়করণ করা হবে। এর ফলে ১৩০৮ কোটি টাকা খরচ হবে প্রতিবছর। প্রথম ধাপে ২২৯৮১টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হবে। এ বিদ্যালয়গুলো ইতিমধ্যে মাসিক সরকারি অনুদান পাচ্ছে অর্থৎ এমপিওভুক্ত বিদ্যালয়। যেসব বিদ্যালয় এমপিও লিস্টে নেই সেগুলো জাতীয়করণ করা হবে ১

www.pathagar.com

জুলাই ২০১৩ এবং তৃতীয় পর্যায়ে বাকিগুলো জাতীয়করণ করা হবে ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে। এমপিও ভুক্ত শিক্ষকগণ সরকারি বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মতো মূল বেতন পান এবং ২০০ টাকা বাড়িভাড়া ও ২০০ টাকা মেডিকেল ভাতা পান। স্থায়ী বা সাময়িক নিবন্ধনভুক্ত স্কুল, কমিউনিটি স্কুল, সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বেসরকারি সংস্থা পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ দ্বিতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণ করা হবে। এদের সংখ্যা ২২৫২। বাকি ১০৫১ বিদ্যালয় যারা অনুমোদন পায়নি বা সরকারি অনুমোদনের অপেক্ষায় তারা তৃতীয় পর্যায়ে জাতীয়করণের আওতায় আসবে।

১৯৭৩ সালে সরকার প্রথম দেশের ৩৬১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করে। পরবর্তী বিভিন্ন পর্যায়ে আরও ১৫০৭টি বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়। দেশে বর্তমানে সরকারি বেসরকারি মিলিয়ে ৮৫০০০ প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। (ডেইলি সান আগস্ট ১৭, ২০১২) যেকোনো দেশের প্রাথমিক শিক্ষা হচ্ছে শিক্ষার প্রথম ধাপ। এই ধাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি হচ্ছে ভিত। এই ভিত মজবুত না হলে ভবিষ্যতে যেকোনো শিক্ষা প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হয় না। আমাদের দেশের প্রাথমিক শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক মান থেকে অনেক দূরে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগতমান এবং শিক্ষাদান আনন্দময় পরিবেশে নিশ্চিত করা ও ঝরে পড়ার হার রোধ করা নিশ্চিত করতে হবে জাতীয়করণের সাথে সাথে।

www.pathagar.com

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় আসতে দিন

উক্ত শিরোনামে 'দৈনিক কালের কণ্ঠে' জনাব আবু আহমদ স্যারের একটি লেখা ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১২ তারিখে আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে সমালোচনামূলক লেখা আমিও লিখি, মানসম্মত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষে আমিও, সার্টিফিকেট বাণিজ্য বন্ধ করে আমরা যারা মানসম্মত শিক্ষার কথা বলি, তারা সবাই চাই কিন্তু তাই বলে আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে বন্ধ করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষে নয়। প্রয়োজনের তাগিদে আমাদের দেশে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থার বাস্তব অবস্থা, অর্থনৈতিক কারণ, জমির স্বল্পতা, সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়েদের পার্শ্ববর্তী দেশে গিয়ে পড়া এবং দেশি মুদ্রা বিদেশে চলে যাওয়া, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সীমিত আসনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য সেশনজট ইত্যাদি কারণগুলো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে কাজ করেছে। এ ছাড়াও নিত্যনতুন প্রয়োজন, চাহিদা ও সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে এ লাইনে। সবগুলো বিবেচনায় নিয়ে আমাদের কথা বলতে হবে।

উন্নত বিশ্বে যেমন প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয় আছে, তেমনি কিচেন মার্কেটের ওপর, ঘোপের ভিতর, চিপা গলির মধ্যেও অনেক বেসরকারি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় আছে। আমরা যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, তখন আমাদের দেশে কোনো বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না। তখন শুনতাম এবং পত্রিকার পাতায় দেখতাম খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, যারা সার্টিফিকেট বিক্রি করে। তখন দেখতাম অনেক অবস্থাপন্ন পরিবারের ছেলে-মেয়ে যারা বাংলাদেশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে চান্স পেত না, তারা

www.pathagar.com

উন্নত বিশ্বে চলে যেত। কয়েক বছর পর বড়সড় সার্টিফিকেট নিয়ে কেউ দেশে ফিরত আবার কেউ ফিরত না। গ্রেট ব্রিটেনে আমাদের দেশের শত শত ছাত্র-ছাত্রী গিয়ে দেখেছে নামকাওয়াস্তে বেসরকারি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আছে, আবার কোথাও তারা কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অস্তিত্বই পায়নি, মারাত্মকভাবে প্রতারিত হয়েছে এসব ছাত্র-ছাত্রী। উন্নত বিশ্বের কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা শিক্ষা ব্যবসার যখন এই অবস্থা, তখন আমাদের মতো দরিদ্র একটি দেশের এই অবস্থা কতটা খারাপ হওয়ার কথা, কিন্তু সেই অনুপাতে অবস্থা অতটা খারাপ নয়।

একটি বিশ্ববিদ্যালয় সমসীমায় প্রতিষ্ঠিত হতে এবং পূর্ণাঙ্গতা পেতে ৫০ থেকে ১০০ বছর সময় লেগে যায়। আমাদের দেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ইতিহাস মাত্র ১৫-২০ বছরের। এই অল্প সময়ের আমরা খুব বেশি একটা আশা করতে পারি না। তার মধ্যেই বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় বেশ ভালোই করছে। যেমন নর্থ সাউথ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, আহসানউল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি, ইস্ট ওয়েস্ট, সাউথ-ইস্ট, ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, আইইউবি, ইউল্যাব। এর মধ্যে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ক্যাম্পাসও তৈরি করে ফেলেছে। এটি কম সাফল্য নয়। সমস্যা হচ্ছে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো পিওর ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি পড়াচ্ছে না। শিক্ষার্থীদের শুধু ব্যবসা শিক্ষা কিংবা উচ্চতর কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করছে, ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মানবিক গুণাবলির বিকাশ কম হচ্ছে। কিন্তু এটিও তো যুগের চাহিদা। একটি নির্দিষ্ট সময় পার হলে নিশ্চয়ই তারাও সেদিকে দৃষ্টি দেবে। আমরা তো রাতারাতি সবকিছুর পরিবর্তন আশা করতে পারি না।

প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল বলে অনেক ছাত্র-ছাত্রী দেশে পড়াশুনা করছে, দেশি মুদ্রা বাঁচাচ্ছে। প্রতিবছর তারা হাজার হাজার ডলারের দেশি মুদ্রা বাঁচাচ্ছে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা ব্যতিক্রম ছাড়া পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের চেয়ে কম্পিউটার বিজ্ঞান ও ইংরেজিতে অধিকতর পারদর্শী। বর্তমান যুগে এ দুটি হচ্ছে সারভাইভাল স্কিল। তারা ছোটখাটো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেও এ স্কিল দুটো ভালোই অর্জন করছে। তাছাড়া রাজনৈতিক সহিংসতা এমনকি বুয়েটসহ প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েরই পরিবেশ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করছে। রাজনৈতিক পরিচয় ছাড়া ছাত্র-ছাত্রীরা আবাসিক হলে থাকতে পারছে না। বিশাল ক্যাম্পাস, খেলার মাঠ, লাইব্রেরি এগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর পজিটিভ সাইড কিন্তু সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী এর কতটা সদ্ব্যবহার করছে বা করতে পারছে, সেখানে কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। আমরা কি মানের ছাত্র-ছাত্রী প্রডিউস করছি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো থেকে সেটাও দেখতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষারমান নিয়ে প্রশ্ন শিক্ষকদের লবিং, রাজনীতি ইত্যাদি বিষয়গুলোতো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই বেশি হচ্ছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এগুলোর স্থান তেমন একটা নেই। আন্তর্জাতিক র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ৩০০০ হাজারের মধ্যেও নেই। এই যখন অবস্থা, তখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক কীভাবে দেশের সব প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দিতে বলেন, বুঝতে একটু কষ্ট হচ্ছে।

আমাদের দেশে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দরকার নেই, প্রয়োজনে বিদেশি শিক্ষক আনা যেতে পারে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'জন শিক্ষক গবেষণা করছেন, ক'জন পড়াশুনা করছেন এবং নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করছেন, এ নিয়ে প্রায়ই পত্র-পত্রিকায় প্রতিবেদন ছাপা হয়। আমরা যখন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছি (জাহাঙ্গীরনগর), তখনও দেখেছি অনেক শিক্ষক দিনের পর দিন ক্লাস নিতেন না। নিজেদের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। অনেকে আবার তাড়াহুড়ো করে দু-একটি প্রিয়ড নিতেন। কোনো জবাবদিহিতা নেই। বিভাগের চেয়ারম্যান নিয়ে রাজনীতি, শেষে হাইকোর্টের নির্দেশে যথাযথ শিক্ষককে চেয়ারম্যান পদে বসানো হয়। ভিসি হবার জন্য লবিং এবং সরকারি ছাত্রসংগঠনের পুতুল হিসেবে থাকা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালগুলোর যেখানে বৈশিষ্ট্য সেগুলোর পরিবর্তনের কোনো সমাধানমূলক আলোচনা না করে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব নিতান্তই অমূলক। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের যেসব শিক্ষক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের কঠোর সমালোচনা করেন, অবসরে যাওয়ার পর তারাই সেখানে গিয়ে পড়াচ্ছেন। তাহলে মান তো খারাপ হওয়ার কথা নয়। আর সার্টিফিকেট বিক্রির কাজ যদি কেউ করেই থাকে, তাহলে তারাও তো তাতে জড়িত।

লেখক ইউজিসিকে শক্তিশালী করার প্রস্তাব করেছেন এটি সমর্থনযোগ্য। তবে এটিও ঠিক যে ইউজিসি যখন শক্তিশালী হবে, তখন সেখানে লবিং বেশি হবে, দুর্নীতি প্রবেশ করবে, রাজনীতি আরও বেশি প্রবেশ করবে। বর্তমানেও তো ইউজিসির চেয়ারম্যান হতে হলে সরকারি দলের শিক্ষক হতে হয়, তাই না? অন্য গ্রুপের যত বড় পণ্ডিতই হোক না কেন তাকে তো চেয়ারম্যান করা হয় না।

প্রয়োজনের তাগিদে হোটেল-বাজারের ওপর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনসংখ্যা অনুপাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আমাদের দেশে এখনও কম। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য ইউজিসি যে পরিমাণ জমির কথা বলেছে তা বাংলাদেশের জন্য কতটা বাস্তব তাও ভেবে দেখতে হবে। প্রতিবছর

www.pathagar.com

আমরা ১ শতাংশ হারে আবাদযোগ্য জমি হারাচ্ছি, তারওপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মিল কারকখানা ও স্কুল-কলেজ আগেকার দিনের মতো প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে এত জমি কোথায় আমাদের? স্বল্প জমির ওপর আমাদের সামাজিক সংগঠনগুলোকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বিশালকায় বিনির্মাণের ধারণা এখন পাল্টাতে হবে। আমাদের দেশে পূর্বে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনেও একটি বড় খেলার মাঠ আছে, হাই স্কুলে খেলার মাঠ, পুকুর, বাগান, মসজিদ এবং অনেক স্কুলে আলাদা ভবনে প্রধান শিক্ষকের বসার স্থান এবং অফিস কক্ষ। বর্তমানে আমরা কি এটি চিন্তা করতে পারি? তবে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে লাইব্রেরি সুবিধা আরও প্রসারিত করতে হবে, ইনডোর গেইমসের আরও ভালো ব্যবস্থা করতে হবে, যেহেতু আউটডোর গেইমসের ব্যবস্থা সব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। চৌদ্দ কোটি জনসংখ্যার দেশে এবং পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতিকরণের যুগে কোনোভাবেই আমরা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করার সুপারিশ করতে পারি না।

www.pathagar.com

জাতীয় জীবনে বিজ্ঞান ও গণিত মেলার গুরুত্ব

আমরা বিজ্ঞানের চরম এক উন্নতির যুগে বাস করছি। আমাদের ব্যক্তিগত এবং জাতীয় জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্র কিংবা অধ্যায়ই বিজ্ঞানের প্রভাবে প্রভাবান্বিত। কিন্তু উল্লেখযোগ্যহারে কমছে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রী। বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি অনীহা দেখা যাচ্ছে আমাদের মাধ্যমিক স্তরের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। বিশেষ করে গ্রামীণ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে। যেসব কারণে গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়তে অনীহা প্রকাশ করে সেগুলো হচ্ছে–

ক. থানা প্রপারের স্কুল ব্যতীত অন্য স্কুলগুলোতে উপযুক্ত বিজ্ঞানের শিক্ষক নেই। বিজ্ঞানের বিষয়গুলো যেহেতু কঠিন উক্ত বিষয়গুলো সহজভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নেই। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান পড়তে আগ্রহী হয় না।

খ. বিজ্ঞানের কঠিন বিষয়গুলোকে আকর্ষণীয়ভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের সামনে উপস্থাপন করা হয় না। অন্যান্য বিষয়ের মতো পাঠদান করা হয় বলে ছাত্র-ছাত্রীরা ভালোভাবে বুঝতে পারে না। ফলে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে।

গ. বিজ্ঞানের সব বিষয়ই বাস্তবধর্মী। বাস্তবধর্মী ক্লাসের মাধ্যমে হাতে-নাতে ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদান করতে হয়। হাতেগোনা কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ব্যতীত এই কাজটি তেমন কোথাও হয় না। আমরা ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি থেকে মাঠ পর্যায়ের শিক্ষক প্রশিক্ষকদের বিভিন্ন স্কুলে পাঠিয়েছিলাম বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি কী অবস্থায় আছে এবং কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তা দেখার জন্য। দেখা গেছে, অনেক স্কুলেই বিজ্ঞানের যন্ত্রপাতি আছে কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে না। ব্র্যাক তার শিক্ষক প্রশিক্ষকদের দ্বারা উপকরণগুলো প্রদর্শন করিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট স্কুলগুলোকে উক্ত যন্ত্রপাতিগুলো ব্যবহার করার জন্য হাতে-নাতে শিক্ষা দিয়েছে।

www.pathagar.com

ঘ. শহর বা সিটিতে বিভিন্ন ধরনের কোচিং সেন্টার আছে, যেখানে ছাত্র-ছাত্রীরা তৈরি নোট পেয়ে থাকে। ফলে বিজ্ঞান পড়তে তেমন একটা অসুবিধা হয় না। তা ছাড়া শহরের স্কুলগুলোতে শিক্ষকরাও অপেক্ষাকৃত অভিজ্ঞ। এ কারণেও গ্রামের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান পড়তে চায় না।

ঙ. বিজ্ঞান শিক্ষা অন্যান্য শিক্ষার চেয়ে ব্যয়বহুল বলেও গ্রামীণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিজ্ঞান পড়তে পারে না।

চ. বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরা সাফল্যের চরম শিখরে আরোহণ করেছে এমন বেশ একটি নজিরও নেই তাদের সামনে যে বিজ্ঞান শিক্ষায় তারা উৎসাহিত হবে।

বিজ্ঞান শিক্ষায় আগ্রহী করা, লো-কস্ট নো কস্ট ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করতে শেখানো, বিষয়গুলোকে সহজভাবে উপস্থাপন করা শেখানো ও শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপন করার ভঙ্গি শেখানোর উদ্দেশ্যে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির-ফেইস প্রোগ্রাম প্রতিবছর গ্রামীণ স্কুলগুলোতে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করে থাকে। দুই দিনব্যাপী এই মেলার মোট প্রজেক্ট সংখ্যা থাকে ৫০-৬০টি। প্রজেক্টগুলো তৈরির ক্ষেত্রে পেইস-বিজ্ঞান গ্রুপ 'লো-কস্ট এবং নো-কস্ট' উপকরণ ব্যবহারের যাতে ভবিষ্যতে গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান শিক্ষায় এর ব্যবহারে উৎসাহী হয় এবং নিজেরাই এ ধরনের বিজ্ঞান মেলা আয়োজন করতে সক্ষম হয়।

বিজ্ঞান মেলা শহর কিংবা থানা সদরে অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু গণিত মেলার কথা আমরা সচরাচর শুনি না বা জানি না। গণিতের বিমূর্ত বিষয়গুলোকে শিক্ষার্থীরা স্পষ্ট করে বুঝে না, অনেকটা না বুঝে অনেকটা মুখস্থ করে গণিতে পাস এবং ভালো ফল করে থাকে। তাই নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যাবলিকে সামনে রেখে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি গণিত মেলার আয়োজন করে থাকে। (১) গণিত উপকরণ ব্যবহারে ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা (২) গণিতের সূত্র মুখস্থ না করে বাস্তবে দেখে শেখানো (৩) চক/ডাস্টার বা বোর্ডে যেসব চিত্র ছাত্র-ছাত্রীদের বুঝানো যায় না, সেগুলো ভালোভাবে বাস্তবে দেখানো (৪) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে থেকে গণিত ভীতি দূর করা

কত দিনের এই গণিত মেলা? দুই দিনের। ২ দিন মেলা পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট স্কুলের ৬০-৬৫ ছাত্র-ছাত্রীদের ৪ দিনের অরিয়েন্টেশন পরিচালনা করা হয়। অরিয়েন্টেশন পরিচালনা করেন ব্র্যাকের টিচার ট্রেইনার। একটি মেলায় মোটামুটি ১০ জন টিচার ট্রেইনার থাকেন। একটি মেলায় মোটামুটি ১০-১২ হাজার টাকা খরচ হয়। ব্র্যাক এবং সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয় যৌথভাবে এই খরচ বহন করে থাকে। প্রতিটি মেলায় সরকারি কিংবা বেসরকারি যেকোনো স্কুলের ছাত্র-

www.pathagar.com

ছাত্রীরা গণিত কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারে। এই প্রতিযোগিতার নম্বর হচ্ছে ৩০ এবং পরীক্ষার সময় হচ্ছে ৪৫ মিনিট। প্রতিটি ক্লাস তিনটি পুরস্কার পেয়ে থাকে। পুরস্কার হিসেবে দেয়া হয় গণিতের কুইজ বই। পরীক্ষার/প্রতিযোগিতার খাতা মূল্যায়ন করে টিচার ট্রেইনারগণ। খাতায় কোড নম্বর বসানো থাকবে।

আমরা জানি, আমাদের দেশে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয় কিন্তু তা সীমাবদ্ধ থাকে শহরে এবং বেশি হলে থানা সদর পর্যন্ত। গণিতের বিষয়গুলো সহজভাবে এবং বাস্তবমুখী করে শেখানোর বিষয়টি অবহেলিতই থেকে যাচ্ছে। নিভৃত পল্লীর বুকে আলোকবর্তিকার মতো দাঁড়িয়ে থাকা শিক্ষা প্রসারের অস্তিত্ব ঘোষণা করছে আমাদের গ্রামীণ বিদ্যালয়গুলো। সাড়া জাগানো কিংবা উৎসাহ উদ্দীপনা সৃষ্টির মতো কোনো কাজ এখানে হয় না। অনেক সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করা যায় এখানকার শিক্ষার্থীদের মেধা। তাই বিজ্ঞান শিক্ষাকে আরও বাস্তবমুখী ও জনপ্রিয় করার মানসে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির-পেইস প্রোগ্রাম নিভৃত পল্লীর পাঠশালাগুলোতে প্রতিবছর আয়োজন করে থাকে বিজ্ঞান মেলা। ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক, শিক্ষক, সরকারি ও বেসরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ অভূতপূর্ব সাড়া দিচ্ছেন এই মেলা আয়োজনে। সকলের এই আনন্দ ও স্বতঃস্ফূর্ততাকে কাজে লাগিয়ে বহুদূর আমরা নিয়ে যেতে পারি এই ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের এবং তাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আবিষ্কারগুলোকে। শিক্ষার্থীদের কাছে বিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করা, হাতে-কলমে বিজ্ঞানকে জানা, সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করা ও বিজ্ঞানভিত্তিক উপস্থাপন দক্ষতা বাড়ানোর পরিকল্পনা আমরা বাস্তবে রূপ দিতে পারি এ ধরনের বিজ্ঞান ও গণিত মেলা আয়োজন করার মাধ্যমে।

www.pathagar.com

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

আপনাকে যদি বলা হয়, যে ব্যক্তি রিক্সা চালাতে পারে না অথচ রিক্সা চালাচ্ছে তার রিক্সায় কোথাও যেতে আপনি চাইবেন? ঐ রিক্সায় আপনি উঠবেন না কারণ আপনার প্রাণ সংহারের ভয় আছে। একজন আনাড়ি লোককে যদি একটি ট্যাক্সিতে উঠিয়ে বলা হয় ট্যাক্সি চালান, সে কি চালাতে পারবে? তার ট্যাক্সি চালানোটা যে কত বিপজ্জনক, সেই কথা ভেবেই কেউই ঐ কাজে তাকে সায় দিবে না। ঐ অপ্রশিক্ষিত ড্রাইভার নিজে মারা যাওয়ার ভয় থাকে এবং যাত্রী কিংবা পথচারী মারার আশঙ্কা থাকে। আমরা রাস্তাঘাটে, গুরুত্বপূর্ণ অফিস-আদালতের সামনে টহলরত আনসার, পুলিশ ও অন্যান্য আইন প্রয়োগকরী সংস্থার লোকজন দেখি অস্ত্র হাতে পাহারারত। ঐ অস্ত্রটি তাদের এমনিতেই ধরিয়ে দেওয়া হয় না। এজন্য তাদের প্রচুর প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে।

যেকোনো পেশায় প্রথম ঢুকিয়েই কিছুদিনের প্রশিক্ষণ নিতে হয়। প্রশিক্ষণ ব্যতীত কোনো পেশায়ই ঠিকমতো কাজ করা যায় না

শিক্ষাদানের মতো মহৎ ও কঠিন কাজে যারা নিয়োজিত, তাদের প্রশিক্ষণ দরকার আরও বেশি কারণ তারা অত্যন্ত সপিস্টিকেটেড বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, তাদের প্রশিক্ষণের বিষয়টি আমরা কেউ ভালোভাবে উপলব্ধি করিনি। কারণ, শিক্ষাখাত উন্নয়নশীল বিশ্বে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত। এই খাতে যা ঘটে ঘটুক, কর্তৃপক্ষের ঐ দিকে তেমন একটা নজর নেই। নজর দেওয়ার তেমন কোনো প্রয়োজনও বোধ করেন না।

www.pathagar.com

কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সদ্য পাস করে সরাসরি আমরা শিক্ষকতায় ঢুকে যাই। তরুণ বয়সের ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াতে যে মনস্তাত্ত্বিক ও মানসিক প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় তা আমার কেউ গুরুত্ব দিই না। কীভাবে তাদের মন জয় করতে হয়, কীভাবে সব ধরনের শিক্ষার্থীদের মনোযোগী করতে হয়, শিখন-প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে হয় তা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষক জানেন।

নির্দিষ্ট বিষয়ের বিভিন্ন পাঠ কীভাবে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, বোধগম্য করা যায় ঐ বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের গবেষণার ফল অনুযায়ী ক্লাস পরিচালনা করতে হয় তা জানার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এ বিষয়টি এখন অনেকটাই অবহেলিত। ক্লাস শুরু করার পর একজন শিক্ষক ক্লাসে ঢুকে কী করছেন তা দেখার কেউ নেই।

আমার মনে আছে, ক্যাডেট কলেজে চাকরি নেওয়ার কিছুদিন পরই বিভিন্ন ক্যাডেট কলেজের যোগদান করা নতুন প্রভাষকদের ফৌজদারহাট ক্যাডেট কলেজে এক মাসের প্রশিক্ষণে পাঠানো হয়। সারাদিন প্রশিক্ষণ, নির্দিষ্ট সময় পর বিভিন্ন ক্লাসে পাঠদান, প্রাকটিস টিচিং, কলেজের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড (ধোপার কাজ, রেশন দেওয়া, হাউসে অবস্থান, ইত্যাদি জানার জন্য প্রশিক্ষণ দরকার)।

এটি চমৎকার এক ধরনের প্রশিক্ষণ। ক্যাডেট কলেজের শিক্ষা সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আলাদা। এখানে চাকরি করার জন্য প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরি, ব্যাপারটি অনুধাবন করে কর্তৃপক্ষ ঐ প্রশিক্ষণের আয়োজন করেন। প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহার, আচার-আচরণ, চলাফেরা সবকিছুর ওপর গোয়েন্দা নজরদারি ছিল। সবকিছুর ওপর মূল্যায়ন করা হয়েছিল। জানি না বর্তমানে ক্যাডেট কলেজে এ ধরনের ব্যবস্থা আছে কিনা। তবে ক্যাডেট কলেজ কর্তৃপক্ষকে আমি অনুরোধ করব যেকোনো কলেজের সাথে একটি স্থায়ী প্রশিক্ষণ একাডেমি স্থাপন করা।

ক্যাডেট কলেজের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, প্রতি টার্ম একজন শিক্ষককে সমস্ত ফ্যাকাল্টি মেম্বারের উপস্থিতিতে ডিমনেস্ট্রেশন ক্লাস পরিচালনা করতে হয়। এতে বিভিন্ন কর্নার থেকে ফিডব্যাক পেয়ে একজন শিক্ষক যেমন তার পেশাগত উন্নয়ন ঘটাতে পারেন, তেমনি তার সাহস ও আত্মবিশ্বাসও বেড়ে যায় বহুগুণ।

www.pathagar.com

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কিংবা কলেজের শিক্ষকদের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। বিএড প্রশিক্ষণ শিক্ষকদের মধ্যে অনেকেই করেন শুধু স্কেল পরিবর্তনের জন্য, কিছু শেখা এবং ট্রেনিং ফলোআপের কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে ধীরে ধীরে তারা প্রশিক্ষণ ভুলে যান।

www.pathagar.com

বাংলাদেশি শিক্ষার্থীরা বিদেশে কেমন আছে

উন্নত বিশ্বের উন্নত জীবন, পরিপাটি রাস্তাঘাট, নিরাপদ ও নিশ্চিত সামাজিক অবস্থা বাংলাদেশের হাজার হাজার তরুণকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আর তাই অজানার উদ্দেশ্যে প্রতিবছর হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ওপারে পাড়ি জমাচ্ছে। গ্রেট ব্রিটেন, সাইপ্রাস, ইটালি, জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও অস্ট্রিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা যাচ্ছে। আসল উদ্দেশ্য যে শুধু পড়াশুনা তা নয়, জীবনে প্রতিষ্ঠা পাওয়া, দেশের বেকারত্বের অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া ইত্যাদি কারণে তারা ঐসব দেশে পাড়ি জমায়। আর ঐসব ছাত্র-ছাত্রীদের বিদেশে পাঠানোর নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে দেশে। দেশের কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি) শিক্ষার্থীদের এক ধরনের টোপ দিয়েই ভর্তি করান যে, ক্রেডিট ট্রান্সফার করে শিক্ষার্থীরা বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারবে। তারা ছাত্র-ছাত্রীর পালস বুঝে এ ধরনের বিজ্ঞাপন দিয়ে থাকে। ইন্টারনেটের যখন খুব একটা প্রচলন আমাদের দেশে শুরু হয়নি, তখন বিদেশে ছাত্র-ছাত্রী পাঠানোর এজেন্সিগুলোর দেয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই ছাত্র-ছাত্রীর বিদেশে চলে যেত। এখন ইন্টারনেটের সুবিধা থাকায় তারা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির খোঁজখবর নিয়ে এজেন্সিগুলোর মাধ্যমে ভর্তি হচ্ছে আর বিদেশে চলে যাচ্ছে। কিন্তু ইন্টারনেটে সবসময়ই খুব ভালো চিত্রগুলো দিয়ে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলা হয়। বিদেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ধরনের সমস্যা আছে যেগুলো তারা ইন্টারনেটে দেননা, আমাদের দেশের ছাত্র-ছাত্রীরা ঐসব বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা কলেজ ভর্তি হয়ে প্রচুর সমস্যায় পড়ে। গ্রেট ব্রিটেনসহ বেশ কিছু দেশের উপার্জনের ভালো পথ হচ্ছে বিদেশি ছাত্র-ছাত্রীদের দেশের

www.pathagar.com

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জায়গা করে দেওয়া। কোনো প্রতিষ্ঠানের খারাপ বা দুর্বল দিকগুলো কখনও ইন্টারনেটে দেওয়া হয় না বিধায় বিদেশের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রকৃত অবস্থা তারা বুঝতে পারে না। অনেকে গিয়ে তাই হাজার সমস্যার মুখোমুখি হয়।

ব্রিটেনে টিআইই আর-৪ ভিসা পদ্ধতির অপব্যবহার করে প্রচুর ছাত্র-ছাত্রী ব্রিটেনে চলে যায়। ২০০৯ সালে এটি চালু হয়। এসব ছাত্র-ছাত্রীরা সপ্তাহে সর্বোচ্চ ২০ ঘণ্টা কাজের অনুমতি পাওয়ার কথা, আসলে তা পায় না। হালে যারা স্টুডেন্ট ভিসা পাচ্ছে, বিশেষত ডিগ্রি লেভেলের নিচে, তারা মাত্র ১০ ঘণ্টা কাজ করার অনুমতি পায়। অধিকাংশ শিক্ষার্থীরাই ডিগ্রি লেভেলে নিচের ভিসায় ব্রিটেনে যাচ্ছে, কাজ পাচ্ছে না। নতুন সেমিস্টারে ভর্তি হতে দুই হাজার পাঁচশত পাউন্ড জমা দিতে হয়। একটু ভালো কলেজ হলে তিন বা চার বা তারও বেশি ফি জমা দিতে হয়। অনেক ছাত্র-ছাত্রীই এত টাকা জমা করতে পারে না বিধায় কাজের জন্য হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়। ওখানে কাজ পেতে হলে যে ভাষাগত দক্ষতা থাকা দরকার, তা নেই অনেকেরই। ফলে হোটেল রেস্টুরেন্ট কিংবা অন্যত্র কাজ পায় না সহজে। সেসব স্টুডেন্ট ব্রিটেনে গিয়েছে তাদের মধ্যে দশ শতাংশ ওখানকার পড়াশুনার উপযুক্ত। তারপরেও তারা যাচ্ছে। কোর্সের সাথে সামলাতে পারছে না। কোনো প্রতিষ্ঠানে অবৈধ শ্রমিক খুঁজে পেলে সর্বোচ্চ দশ হাজার পাউন্ড জরিমানা দিতে হয় ঐ প্রতিষ্ঠানকে। অতএব জেনেশুনে কোনো প্রতিষ্ঠান এই রিস্ক নিতে রাজি হয় না, ফলে ভুয়া ছাত্ররা কিংবা ইংরেজিতে যারা কমিউনিকেট করতে পারে না তারা কাজ পায় না।

'২০০৯ সালে ইউকে পয়েন্ট বেইজড সিস্টেমের (টিয়ার-৪) আওতায় মোট এক হাজার ৯৮৭টি কলেজের লাইসেন্স বাতিল করেছে ব্রিটেন সরকার। এর মধ্যে ২০০ কলেজের মালিক বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এবং পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটে ছিল। ইউকে বোর্ডার ফোর্স গত বছরের মধ্যে জানুয়ারিতে বাংলাদেশি মালিকানায় ৬৮টি কলেজের স্পন্সর লাইসেন্স বাতিল করেছে। মালিকরা এ নিয়ে শংকিত।' (১৫ মার্চ, কালের কণ্ঠ, ফারুক যোশী) অনেক ছাত্র-ছাত্রী অবৈধ পথে ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানিতে পাড়ি জমাচ্ছে। অবৈধ পথে উন্নত বিশ্বে ঢুকতে গিয়ে অনেকের সলিলসমাধি ঘটেছে। তারপরেও থেমে নেই বিদেশে শিক্ষার্থীর যাওয়ার স্রোত।

www.pathagar.com

জাপানে ভুয়া ছাত্রদের বলা হয় "উছো গাখছাই"। উছো গাখছাইদের খোঁজে জাপানি গোয়েন্দা পুলিশেরা বিভিন্ন হোটেল-রেস্টুরেন্টে তল্লাশি চালায়। শনাক্ত করে এদের পরে দেশে পাঠিয়ে দেয়। জাপানি পুলিশ যেহেতু একটু ভদ্র, তাই তারা ভুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের প্রথমে দেশে চলে যেতে অনুরোধ করে, না আসলে অ্যারেস্ট করে।

আমাদের দেশ থেকে যেসব ছাত্ররা বিভিন্ন দেশে যায় তারা স্বভাবতই দেশের সচ্ছল পরিবারের ছেলে-মেয়ে। অনেক পরিবারের ছেলে-মেয়ে অনেক আদরে মানুষ হয়েছে, গোসল করার পরে কাপড়টিও নিজে ধোয়নি , এসব ছেলে-মেয়েরা বিদেশে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে কাজ করে, গভীর রাতে বাসায় ফিরে আবার রান্না করে। দেশে থেকে যদি এরা এর অর্ধেক পরিশ্রমও করত তা হলে দেশের চেহারা অনেকটাই পাল্টে যেত। আমার জানামতে অনেক ছাত্র আছেন যাদের ইতিমধ্যে ঢাকায় বাড়িঘর আছে, ব্যবসা আছে; তারা লন্ডনে গিয়েছে পড়তে। মাঝে মাঝে ফোন করে, বলে স্যার ফলের দোকানে কাজ করছি। অথচ এরা ঢাকায় থাকতে নিজে ফল কখনও কিনেও খায়নি, বাসার লোকজন কিনত, তাই খেত। লন্ডন নামের জায়াগটি তাদের আকর্ষণ করে বলে সেখানে যায়। আমার এক সহকর্মীর একমাত্র ছেলে সাইপ্রাসে গিয়েছিল পড়তে, বছরখানেক পড়ে অজানা এক কারণে লাশ হয়ে দেশে ফিরছে, আজও কেউ জানতে পারেনি আসলে তার কি হয়েছিল।

আমাদের ছোট এই দেশ অতিরিক্ত জনসংখ্যার ভার যেন আর সইতে পারছে না, দেশও আর আগ্রহ দেখাচ্ছে না উঠতি বয়সের বিদেশগামী এই যুবকদের দেশে রাখতে। একদিকে অবশ্য দেশের জন্য ভালো কারণ চাকরির বাজারের ওপর চাপ কমছে। দ্বিতীয়ত, তারা দেশের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা পাঠাচ্ছে, কম বেশি যাই হোক। অতএব এসব ছাত্র-ছাত্রীর ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ও সঠিক কিছু পদক্ষেপ এবং নীতিমালা তৈরি করা দরকার। শুধু এজেন্সিগুলোর ওপর নির্ভরশীল না থাকা উচিত। তবে রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো ব্যবস্থা করতে গেলেই সেখানে দুর্নীতি আর অপদস্থতা এসে হাজির হয়, এ ব্যাপারটি গভীরভাবে দেখতে হবে সরকারকে। সর্বোপরি, আমাদের দেশের মিশনগুলোর উচিত দেশের সার্বক্ষণিক খোঁজখবর নেওয়া, কোন প্রতিষ্ঠানে পড়ছে তার খোঁজখবর নেওয়া। ঐসব প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে কথা বলা এবং দেশকে সব সময় আপটেড রাখা,

www.pathagar.com

যাতে পরবর্তী সময়ে যারা যাচ্ছে, তারা যাতে অন্ধকারে ঝাঁপ না দেয়। পার্টটাইম কাজের ব্যাপারেও খোঁজখবর নেওয়া এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলোর সাথে কথা বলা উচিত। আমাদের বিদেশি মিশনগুলোর মনে রাখা উচিত, তারা দেশের মানুষের ট্যাক্সের টাকায় বিদেশে মিশনে চাকরি করছেন, আর বিদেশে যারা কাজ করছেন বা পড়াশুনা করছেন তারা দেশের অর্থনীতিতে সরাসরি অনেক অবদান রাখছেন। বিদেশে শিক্ষা এবং কাজের বাজার আমাদের বাড়াতেই হবে, দেশের স্বার্থে। বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।

www.pathagar.com

শিক্ষক প্রশিক্ষণ এবং ব্র্যাকের ভূমিকা

শিক্ষা একটি জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। শিক্ষা কোনো জাতির আলোকবর্তিকা। আর শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ জাতি গঠনে পালন করে বিশাল এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। অতএব শিক্ষকদের মানোন্নয়ন শিক্ষা বিভাগ তথা পুরো রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব এবং কর্তব্য। দুঃখজনক হলেও সত্য যে আমরা এখনও শিক্ষকদের মানোন্নয়নের জন্য উল্লেখযোগ্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতে এবং যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারিনি। আর তাই মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা গুণগত শিক্ষাগ্রহণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, যার ফলে শিক্ষার দৈন্যদশা পরিলক্ষিত হচ্ছে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত। আমাদের এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে। ব্র্যাক একটি উন্নয়ন সংস্থা। বর্তমানে ব্র্যাক দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিদেশেও কাজ করছে। তাই আমরা ব্র্যাককে শুধু জাতীয় না বলে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা বলতে পারি। ব্র্যাকের বিচরণ শুধু মাইক্রো ক্রেডিট কিংবা স্বাস্থ্য জগতে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের শিক্ষার উন্নয়নে ব্র্যাক নীরবে পালন করে যাচ্ছে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ব্র্যাকের রয়েছে ৩৬০০০ প্রাইমারি এবং ২২০০০ প্রি-প্রাইমারি বিদ্যালয়। ব্র্যাক বর্তমানে ২৬০০-এর অধিক বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করে। মাধ্যমিক পর্যায় শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ স্তর। এই স্তরের গুণগত শিক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। সুনাগরিক এবং যোগ্য কর্মী তৈরির নিমিত্তে এই স্তরের শিক্ষা সর্বাগ্রে গুরুত্বের দাবিদার।

মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নযনে সরকারের পাশাপাশি ব্র্যাক কাজ করে যাচ্ছে। ব্র্যাকের উল্লেখযোগ্য কাজগুলোর মধ্যে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ, ম্যানেজমেন্ট প্রশিক্ষণ, মূল্যবোধ শিক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদর জন্য বিশেষ সহযোগিতা এ সহযোগিতা একনাগাড়ে তিন মাসের। ব্র্যাক মাধ্যমিক পর্যায়ে ইংরেজি, গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রশিক্ষণগুলো ব্র্যাকের

www.pathagar.com

নিজস্ব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ আবাসিক। দুটো মডিউলে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। প্রতিটি মডিউল তিন সপ্তাহের। ২০০৩ সালে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ শুরু হওয়ার পর থেকে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সাত হাজারের অধিক ইংরেজি, চার হাজার বিজ্ঞান এবং সাত হাজার গণিত শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। প্রতিটি শিক্ষকের জীবনে প্রশিক্ষণ একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়। প্রশিক্ষণ ব্যতীত একজন শিক্ষক উন্নতমানের, যুগোপযোগী এবং ফলপ্রসূ শিক্ষাদান করতে পারেন না। শিক্ষাব্যবস্থার অনেক অবহেলার সাথে প্রশিক্ষণ ব্যাপারটি থেকেছে মারাত্মকভাবে উপেক্ষিত। কিন্তু আমাদেরকে বুঝতে হবে, শিক্ষার সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে শিক্ষদের প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে প্রয়োজন কারণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন শিক্ষকই পারেন যথাযথ এবং ফলপ্রসূ শিক্ষা দান করতে। আধুনিক যুগের সাথে তাল মিলিয়ে শিক্ষাদান পদ্ধতি কীভাবে এগিয়ে যাচ্ছে তার সাথে পরিচিত হওয়া এবং সেখান থেকে নতুন নতুন পদ্ধতি এবং কৌশল জেনে নেয়া একজন শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের জন্য খুবই প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের কথা বিবেচনায় রেখে ব্র্যাক গ্রহণ করেছে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ।

ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড ঢাকা সিটি থেকে শুরু করে তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। মাঠ পর্যায়ে যেসব কর্মী আছেন তারা শিক্ষদের উদ্বুদ্ধ করেন প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি কর্মসূচি সংগঠক আট থেকে বারটি স্কুল দেখাশুনা করে থাকেন। এসব কর্মীরা শিক্ষকদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করেন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে প্রেরণ করেন। উল্লেখ্য, ব্র্যাক শুধু গ্রামের এবং বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কাজ করে, কারণ সরকারি এবং শহরের বিদ্যালয়গুলোর অবস্থা অনেক ভালো। সরকারি স্কুলগুলো এবং শহরের স্কুলগুলোর অবস্থা অর্থনৈতিকভাবে ভালো থাকায় এসব স্কুলসমূহ তুলনামূলক ভালো শিক্ষক এবং ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারে, যা গ্রামীণ স্কুলগুলোতে সম্ভব হচ্ছে না আর তাই ব্র্যাক এই পিছিয়ে পড়া স্কুল এবং শিক্ষকদের নিয়ে কাজ করছে। গত বছর ব্র্যাক ঢাকা সিটির পিছিয়ে পড়া ৫০টি স্কুল ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির আওতাভুক্ত করে আরবান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে প্রশিক্ষণের কাজ শুরু করেছে।

কারা এই প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন? ব্র্যাক প্রথম দিকে সাধারণত তিন ধরনের প্রশিক্ষক দিয়ে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করত। ব্র্যাকের কোর গ্রুপের সদস্য, যারা প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত এবং স্ব স্ব বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স। এদের মধ্যে অনেকেরই দেশের নামীদামি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আর একদল প্রশিক্ষক, যারা টিচার্স ট্রেইনার নামে পরিচিত। টিচার্স ট্রেইনারগণ ব্র্যাকের

www.pathagar.com

নিয়মিত কর্মী এবং তারা ব্র্যাকের মাঠ পর্যায়ে কাজ করেন এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন। তারাও স্ব স্ব বিষয়ে অনার্সসহ মাস্টার্স। তৃতীয় আর এক দল ট্রেইনার যারা কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তবে তাদেরকে ব্র্যাকের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হয়, যা ট্রেনিং অব ট্রেইনারস (টিওটি) নামে পরিচিত।

শিক্ষক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে গিয়ে ব্র্যাক কিছু অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। ব্র্যাক সব সময়ই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। বাইরের প্রশিক্ষকগণ সবসময় সময়ানুবর্তী হতে পারছেন না। তাদের মধ্যে অনেকেই মাধ্যমিক পর্যায়ের সিলেবাসের সাথে গভীরভাবে পরিচিত নন। এ ছাড়াও গেস্ট টিচার/ রিসোর্স টিচারগণ তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের কাজ করার পর ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে গিয়ে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। তখন ব্র্যাক চিন্তা করল মাধ্যমিক পর্যায়ে অনেক মেধাবী এবং দক্ষতাসম্পন্ন শিক্ষক আছেন, যারা একটু সুযোগ পেলে প্রশিক্ষক হতে পারেন। তাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে পারেন, যদি তাদেরকে একটু সুযোগ করে দেয়া যায়। তারা বৃহত্তর মণ্ডলে অবদান রাখতে পারেন, যদি তাদেরকে সেভাবে তৈরি করা যায়। ব্র্যাকের এ নতুন চিন্তার বাস্তবায়ন ঘটেছে ২০০৪ থেকে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পেশাগত উন্নয়ন, তাদের কর্মপরিধি প্রসারণ, আত্মবিশ্বাস বাড়ানো এবং তাদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে দেশ ও জাতির বৃহত্তর কল্যাণে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে ব্র্যাক 'মাস্টার ট্রেইনার' উন্নয়ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে।

কীভাবে মাস্টার ট্রেইনার নির্বাচন করা হয়:

ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সময় প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণার্থীদের ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। তাদের বাচনভঙ্গি, কথা বলার ক্ষমতা, প্রিটেস্ট এবং পোস্ট-টেস্টের ফলাফল, প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণে আগ্রহ ইত্যাদি বিষয়গুলো ভালোভাবে লক্ষ করা হয়। এসব গুণাবলির অধিকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের 'মাস্টার ট্রেইনার' (এমটি) করার জন্য ছয় দিনের একটি বিশেষ প্রশিক্ষণে ডাকা হয়। ছয় দিনের এই প্রশিক্ষণ ট্রেনিং অব ট্রেইনারস (টিওটি) নামে পরিচিত। এই প্রশিক্ষণ দেশি এবং বিদেশি বিশেষজ্ঞরা পরিচালনা করা হয়। একজন শিক্ষককে কমপক্ষে দুটো টিওটি-তে অংশগ্রহণ করতে হয়। টিওটি করার সময় পুনরায় তাদের পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং তাদেরকে একটি লিখিত পরিক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়। পর্যক্ষেণ করা হয় তাদের একাডেমিক পারফরম্যান্স, কথা বলার দক্ষতা, বাচনভঙ্গি এবং আচার-আচরণ।

www.pathagar.com

ছয় দিন করে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রতি এমটিকে কমপক্ষে দু'বার নিতে হয়। দু'বার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার পরে তাদেরকে পর্যবেক্ষক হিসেবে তিন দিনের জন্য ব্র্যাক ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয়। তারা সেখানে ভালো কোনো প্রশিক্ষকের ট্রেনিং পর্যবেক্ষণ করেন এবং দু'-একটি সেশনে ক্লাস পরিচালনা করে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান আহরণ করেন। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জন করেন, যাতে তারা আত্মনির্ভরশীল প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারেন। পরবর্তী আরও তিন দিন জন্য অন্য আর একটি ট্রেনিং সেন্টারে পাঠানো হয কো-ট্রেইনার হিসেবে। কো-ট্রেইনার হিসেবে তারা ট্রেইনিং পরিচালনা করেন এবং ব্র্যাকের একজন ট্রেইনার তার ট্রেনিং নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিয়ে থাকেন। তার রিপোর্ট এবং উক্ত শিক্ষকের পুরো পারফরম্যান্স বিবেচনা করে উক্ত শিক্ষককে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয়।

ফেব্রুয়ারি ২০০৮ পর্যন্ত ৮৫ জন ইংরেজি মাস্টার ট্রেইনার বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৫০ জন নিয়মিত ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন। গণিত বিষয়ে ৮০ জন এবং বিজ্ঞান বিষয়ে ৩৭ জন মাস্টার ট্রেইনার উন্নয়ন করা হয়েছে। ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে গিয়ে তাদের অভূতপূর্ব পেশাগত উন্নয়ন হয়েছে। যেমন ইংরেজি বিষয়ের এমটি-দের উন্নয়ন সরাসরি চোখে পড়ার মতো। এসব শিক্ষকগণ সাধারণত কখনই ক্লাসে ইংরেজিতে কথা বলতেন না যদিও ইংরেজি ক্লাসে ইংরেজিতে কথা বলারই কথা ছিল। তারা পূর্ব থেকে চেষ্টা করলে ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন কিন্তু কখনই তা করেননি অথচ তাদের সে যোগ্যতা ছিল। তাদের এই যোগ্যতা এবং প্রতিভা ঘুমিয়ে ছিল, তারা নিজেরাও তাদের এই প্রতিভা সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তাদের এই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে এমটি ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে। এখন তারা অনায়াসে অনর্গল ইংরেজিতে কথা বলে যাচ্ছেন যে কোনো সংখ্যক লোকের সামনে। তাদের জ্ঞান আহরণের পিপাসা বেড়ে গেছে বহুগুণ।

নিভৃত পল্লীর অনেক শিক্ষক বিশেষ করে যারা এমটি হয়েছেন, তাদের অনেকেই নতুন উৎসাহে উচ্চ শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হয়েছেন, অনেকেই ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে চাকরি পেয়েছেন। তাদের আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে বহুগুণ। কেটে গেছে তাদের জড়তা, ভয় এবং ভীতি। শুধু দেশের ভালো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, কেউ কেউ বিদেশেও চলে গেছেন। কেউ কেউ প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় ভালো করছেন, প্রতিযোগিতা করছেন দেশের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের টিচারদের সাথে।

www.pathagar.com

বর্তমানে দেশের বিশটি উপজেলার সবক'টি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরীক্ষামূলকভাবে ব্র্যাকের তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দেয়ার সরকারি সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি, শিক্ষক নেতারা এবং প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ। আমরা সবসময় নতুনের বিরুদ্ধে। নতুন সব সময়ই ভালো ও মঙ্গলজনক কিন্তু আমরা নতুনকে গ্রহণ করতে জানি না, ফলে নতুন যে মঙ্গলজনক বার্তা আমাদের জন্য নিয়ে আসে আবার তা ফিরে চলে যায়। কাজেই কোনো প্রতিষ্ঠানের মহতী কোনো উদ্যোগকে আমরা না জেনে যেন কোথাও কোনো বিভ্রান্তি না ছড়াই। আমাদের ছোটখাটো স্বার্থের চেয়ে জাতির বৃহত্তর কল্যাণের দিকে নজর দেয়াটাই অধিকতর যুক্তিযুক্ত।

আমাদের শিশুরা পাঠভারাক্রান্ত এবং অধিকাংশ স্কুল পরিণত হয়েছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে।

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হলো। জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের মুখের হাসি ইতিমধ্যেই মলিন হয়ে গেছে ভালো কলেজে ভর্তির চিন্তা নিয়ে। এ নিয়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন ধরনের লেখালেখি হচ্ছে, আমি আজকে অবশ্য কলেজে ভর্তি হওয়া নিয়ে লিখছি না, লিখছি শিশুদের ভর্তি হওয়া নিয়ে। শিশুদেরকে ভালো কোন স্কুলে ভর্তির জন্য মারাত্মক ভর্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়, যা তাদেরকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে ফেলে। রাজধানী ঢাকায় হাতে গোনা নামীদামি কয়েকটি স্কুলে আসন সংখ্যার তুলনায় ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে বহুগুণ ছাত্রছাত্রী। একটি উদাহরণ থেকে এর ভয়াবহতা স্পষ্ট হয়ে উঠে। আইডিয়াল স্কুল ও কলেজ ঢাকা সিটির একটি নামকরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এ স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য ২৪০টি সিটের বিপরীতে প্রায় ১০ হাজার শিশু পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল। এ তীব্র প্রতিযোগিতামূলক ভর্তিযুদ্ধ ছোট ছোট শিশুদের দেহ ও মনে মারাত্মক স্নায়ুচাপের সৃষ্টি করে, যা আমরা কখনও ভেবে দেখি না। শুধু তাই নয়, অভিভাবকদেরকেও ঠেলে দিচ্ছে এক অসুস্থ প্রতিযোগিতার দিকে।

গত বিশ বছরে ঢাকা সিটির জনসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ কিন্তু সে হারে মানসম্পন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়েনি, যাও বেড়েছে মানোন্নয়নের চেষ্টা করা হয়নি সেসব স্কুল ও কলেজে। একসময় দেশের জেলা স্কুলগুলো অর্থাৎ সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো লেখাপড়ায় এগিয়ে ছিল। এখন হয়েছে উল্টো। দুর্নীতি, মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের শিথিলতার কারণে সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো তাদের মান বজায় রাখতে পারছে না। মান বজায় রাখা,

www.pathagar.com

মানসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ এবং ভর্তি পরীক্ষার মধ্যে নেই কোনো সমন্বয়, নেই শিশুদের বয়স অনুযায়ী প্রশ্ন প্রণয়নের কোনো ব্যবস্থা। ফলে এক এক স্কুল এক এক ধরনের প্রশ্ন প্রণয়ন করছে। আমাদের শিশুদেরক ঠেলে দিচ্ছে এক চরম অনিশ্চয়তা ও হতাশার মধ্যে।

আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের অনেক কিছু দিয়েছে আবার নিয়েছে ও অনেক কিছু। বিজ্ঞান আমাদের শিশুদের করেছে গৃহবন্দি। শিশুরা এখন নির্মল পরিবেশ থেকে আনন্দ পাওয়ার কথা চিন্তা করে না, তারা বসে থাকে টিভির সামনে। ঘন্টার পর ঘন্টা তারা বসে থাকে টিভির সামনে। তাদের চোখ এবং স্নায়ুর উপর পড়ছে মারাত্মক চাপ। শুধু তাই নয়, বইয়ের ভারে ন্যুজ হয়ে পড়ছে আমাদের শিশুরা। যে বয়সে তার হাতে কোনো বই থাকার কথা নয়, হাতে থাকার কথা শুধু খেলাধুলার সামগ্রী, সে বয়সে আমরা তার হাতে তুলে দিয়েছি গাদা গাদা বই। শিশুদের মানসিক বৃদ্ধির জন্য খেলাধুলা অপরিহার্য। এ ব্যাপারটি আমরা ভুলতে বসেছি।

স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় স্থান করে নিয়েছে ভাড়া করা বাড়িতে। সেখানে নেই কোনো খেলার মাঠ, নেই ফুলের বাগান কিংবা মুক্ত ঘুরে বেড়ানোর কোনো ব্যবস্থা। শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য দরকার খোলা মাঠে ঘুরে বেড়ানো এবং খেলাধুলা– এর কোনোটির ব্যবস্থাই নেই শিশুদের বর্তমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে। শিশুদের জীবন স্কুল এবং বাসার মধ্যে সীমাবদ্ধ। নেই তাদের চিত্তবিনোদনের কোনো নির্মল ব্যবস্থা। তাদের জীবন শুধু পড়াশুনা এবং স্কুলে যাওয়া আসার মধ্যে আটকে পড়ে গেছে। জাতির এ ভবিষ্যৎ নাগরিকদের কাছে আমরা কি প্রত্যাশা করতে পারি? আমরা তাদের দিতে পারিনি খেলার মাঠ, করতে পারিনি চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা এবং নিশ্চিত করতে পারিনি নির্মল পরিবেশে শিক্ষাগ্রহণের পরিবেশ।

সকাল হলেই দেখা যায় মা-বাবারা বাচ্চাদের নিয়ে ছুটছেন স্কুলে। ছেলে-মেয়েদের চেয়ে তাদের কষ্ট এবং ব্যস্ততা কম নয় বরং বেশি। অধিকাংশ অভিভাবক মনে করেন যেসব স্কুলের নাম সবাই চেনে এবং জানে সেসব স্কুলে বাচ্চা ভর্তি করাতে না পারলে বোধহয় সমাজে তাদের মান কমে যাবে। এ ভুল ধারণা থেকে তাদের মাঝে যে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে তা কোমলমতি বাচ্চাদের দেহ ও মনের উপর ফেলছে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া। স্কুল, শিক্ষক কিংবা অভিভাবক কেউই ভেবে দেখছে না ব্যাপারটি।

www.pathagar.com

তীব্র প্রতিযোগিতা স্কুল কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকদেরকে এক অনাকাঙ্ক্ষিত অবস্থার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটছে তাদের প্রশ্নপত্র প্রণয়নে। কোমলমতি শিশুদের হাতে থাকার কথা ছিল ছবি দেখে দেখে পড়ার বই এবং খেলাচ্ছলে পড়ার। অথচ তাদের সে খেলা এবং ছবি দেখা উধাও হয়ে গেছে। তাদের সামনে ভর করছে কঠিন প্রতিযোগিতা। এ প্রতিযোগিতার ভার তারা যেন আর সইতে পারছে না। তাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বিসিএস পরীক্ষার আদলে। তাদের জানতে হচ্ছে সার্ক কী এবং কেন, কোন প্রাণীর কী বৈশিষ্ট্য, কোন দেশ কবে স্বাধীন হয়েছে, কোন্ দেশের মুদ্রার কী নাম ইত্যাদি। এতে তাদের মেধা ও মননের বিকাশ কতটা হচ্ছে তা শিশু বিজ্ঞানীরা বলতে পারেন। আমরা সাধারণেরা বলতে পারি এতে তাদের মেধা ও মনন বিকাশের চেয়ে মানসিক চাপে ভোগে বেশি।

জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। উদ্যোগ নিতে হবে সুশীল সমাজকে, অভিভাবকদের এবং শিক্ষিত সমাজকে। সরকারকে পালন করতে হবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ও অগ্রণী ভূমিকা। জাতির অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতে হবে সরকারকে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধারদের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা সরকারের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। শিক্ষিত ও সচেতন নাগরিকদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে।

শিশুদের সবধরনের স্কুলের জন্য প্রণয়ন করতে এক অভিন্ন নীতিমালা। এক ও অভিন্ন নীতিমালার আওতায় আনতে হবে শিশু শিক্ষাব্যবস্থা।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেসব ছোট ছোট কিন্ডারগার্টেন স্কুল আছে, সেগুলোকে একত্রিত করে বড় বড় আকারের স্কুল তৈরি করার ব্যবস্থা নিতে হবে, যেখানে থাকবে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির সব উপকরণ। কারণ আমারে মনে রাখতে হবে আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। আমরা যদি শিশুদের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে পারি তবেই জাতির মঙ্গল। এ বাস্তব সত্য কথাটি আমাদের সবাইকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে হবে।

জাতীয় পর্যায়ে নিয়মকানুন তৈরির ব্যবস্থা নিতে হবে। কোনো ব্যক্তিগত আইনের দ্বারা কোনো স্কুল পরিচালনা করা যাবে না। শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধির জন্য যেসব ব্যবস্থা নেয়া দরকার, শিশুবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের সাথে আলোচনা করে জাতীয় পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ করতে হবে।

স্কুলের সময় নির্ধারণ করতে হবে শিশুদের শরীরের দিকে লক্ষ রেখে। বর্তমানে ঢাকা সিটি কিংবা অন্যান্য বড় সিটিতে স্কুলের যে সময় নির্ধারণ করা আছে, তাতে

www.pathagar.com

ছাত্র-ছাত্রীদের ঘুম পুরো হয় না। দিনের পর দিন এভাবে ঘুম পুরো না হওয়ায় তাদের শরীর ও মনের উপর মারাত্মক এক বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। আমরা এ কথা কখনও ভেবে দেখি না। শিশুরা আমাদের ভবিষ্যৎ। সুষমভাবে তাদের বেড়ে উঠার সুযোগ করে দেয়া আমাদের সকলের দায়িত্ব। আমরা যদি এ দায়িত্ব এড়িয়ে যাই কিংবা যাওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম আমাদের ক্ষমা করবে না।

www.pathagar.com

কোচিং সেন্টার এবং প্রাইভেট কোচিং কি আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ধ্বংস করছে?

দেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে ওঠা বিভিন্ন ধরনের কোচিং সেন্টারগুলো আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে ধ্বংস করতে বসেছে। শুধু আনুষ্ঠানিক শিক্ষার বিকল্প নয় বরং আনুষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছে এই শিক্ষাদানরূপী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে উঠেছে? নিশ্চয়ই সময়ের দাবিতে এবং সময়ের প্রয়োজনে। আমাদের আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে পারেনি এবং তাদেরকে স্কুল ও কলেজের প্রতি আগ্রহী করতে পারেনি। তাই ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমাচ্ছে কোচিং সেন্টারগুলোতে। স্কুল-কলেজের ক্লাসরুম ফাঁকা অথচ ভিড় কোচিং সেন্টারগুলোতে। স্কুল-কলেজে ছাত্র-ছাত্রী রাখার জন্য বিভিন্ন ধরনের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে– শারীরিক ও অর্থনৈতিক শাস্তি, কিন্তু তারপরেও সন্তোষজনক উপস্থিতি নেই ক্লাসে।

দিন দিন প্রতিযোগিতা বেড়ে যাচ্ছে এবং এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার মতো যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো ভূমিকা পালন করতে পারেনি বিধায় অভিভাবক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা কোচিংমুখী হয়েছে। ব্যতিক্রম ছাড়া কোচিংগুলোও তাদের সে প্রত্যাশা পূরণে সফল হয়েছে আর তাই এই ব্যবসা ছড়িয়ে পড়েছে দেশের আনাচে-কানাচে। দিনে দিনে এর ভিত হয়েছে মজবুত এবং শক্ত। কারণ ছাড়া কোনো কিছুই হয় না। সময় এবং প্রয়োজন জন্ম দিয়েছে এসব কোচিং সেন্টারের কাজেই বৃহৎ কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়া হুট করে এই সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়া যাবে না। আর তাই বন্ধ হচ্ছে না।

কোচিং সেন্টারগুলোর সাথে যুক্ত হয়েছে অনেক বেকার তরুণ, কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা।

www.pathagar.com

অনেকের রুটি রোজগারের ব্যবস্থা হয় এখান থেকে, তবে রুটি রোজগার যেন অবৈধ পন্থায় না হয়, সেদিকেও আমাদের দৃষ্টি রাখতে হবে। কোচিং সেন্টারগুলো যদি স্কুল ও কলেজের বিকল্প হয় তা'হলে আনুষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কি ভূমিকা আছে? শুধু কি সার্টিফিকেট অর্জন করার মাধ্যম? আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে সেটি হচ্ছে ছেলে-মেয়েরা দিবসের বড় অংশ কাটায় স্কুল ও কলেজে, তারপর যদি আবারও কোচিং সেন্টারে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটাতে হয়, স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, এত সময় তাদের কোথায়?

হুট করে বাস্তব কারণে গড়ে ওঠা কোচিং সেন্টারগুলো বন্ধ করে দেয়া যাবে না, কারণ কোচিং সেন্টারগুলো বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। কাজেই আমাদের দেখতে হবে কেন গজিয়ে উঠেছে এই সেন্টাগুলো এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে। নিম্নে উল্লিখিত কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে যে বিভিন্ন ধরনের দুর্নীতি চলছে, সেগুলো বন্ধ হবে এবং শিক্ষার্থীরাও স্কুল ও কলেজমুখী হবে।

প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তিনটি টার্ম পরীক্ষা হবে। প্রতিটি টার্ম পরীক্ষার খাতা ইন্টার-স্কুল এবং ইন্টার-কলেজ শিক্ষকগণ পরীক্ষা করবেন। নিজস্ব স্কুল কিংবা কলেজের টিচার কোন খাতা মূল্যায়ন করবেন না। খাতা মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষকদের সম্মানী থাকবে। তাহলে তারা খাতাও ভালোভাবে দেখবেন এবং ছাত্র-ছাত্রীরা উপকৃত হবে কারণ খাতা ভালোভাবে মূল্যায়ন করে ছাত্র-ছাত্রীদের দেখানো উচিত যাতে তারা তাদের ভুলত্রুটি ধরতে পারে এবং শোধরাতে পারে যে কাজটি এখন অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই হয় না। আর খাতা মূল্যায়নও প্রাইভেট প্রাকটিস দারুণভাবে প্রভাবিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যে শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করেন স্কুল ও কলেজের উক্ত শিক্ষকদের পেছনে পেছনে ছাত্র-ছাত্রীরা ভিড় জমায়।

একই স্কুলের কিংবা কলেজের শিক্ষক প্রশ্নপত্রও প্রণয়ন করবেন না। অন্য স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষক প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করবেন। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করা এক ধরনের দক্ষতা, এই দক্ষতা সবার থাকে না। প্রশ্ন করে করে শিক্ষকদের এই দক্ষতা অর্জন করতে হয়। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার জন্য শিক্ষকদের যথাযথ সম্মানী থাকবে।

ইন্টারনাল পরীক্ষাগুলোতে এক স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ অন্য স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা গ্রহণ করতে যাবেন। তা হলে একদিকে যেমন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের মধ্যে আন্তরিকতা বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের কর্মপরিধিও বৃদ্ধি পাবে। তাদের মন উদার হবে। পরীক্ষায় ডিউটি করার জন্য এবং আসা-যাওয়ার সম্মানী

www.pathagar.com

পাবেন। এতে শিক্ষকদের মন উদার হবে এবং প্রাইভেট পড়ার প্রবণতাও কমে যাবে।

নিজের স্কুল কিংবা কলেজের প্রশ্ন করলে কয়েক ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হয়। যে শিক্ষক প্রশ্নপত্র তৈরি করেন দেখা যায় ছাত্র-ছাত্রীরা তার পেছনে ঘুর ঘুর করতে থাকে, তার বাসায় দেখা যায় আর একটি স্কুল কিংবা কলেজ। অনেক শিক্ষক আছেন তারা নীতি নৈতিকতার মাথা খেয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের প্রশ্নপত্র ফাঁস করে দেন। পরবর্তী পরীক্ষার পূর্বে দেখা যায় উক্ত টিচারের বাসায় আরও ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়। এই দৃশ্য এবং ঘটনা এখন ওপেন সিক্রেট। অথচ এর কোনো সুরাহা হচ্ছে না। এ ব্যাপারে দ্রুত এবং কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। কেউই কোনো কথা বলছেন না এই সেনসেটিভ বিষয়টি নিয়ে।

শিক্ষকদেরও অর্থের প্রয়োজন আছে। যুগ পাল্টেছে, এখন আর সেই সময় নেই যে শিক্ষকগণ বিনা পয়সায় ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞান দান করবেন। আবার এটিও ঠিক শিক্ষকগণ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হবেন, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যেভাবে জ্ঞানের চর্চা হচ্ছে, তার সাথে পরিচিত হবেন। কিন্তু শিক্ষকগণ প্রাইভেট পড়ানোটাকে এমনভাবে আঁকড়ে ধরেছেন যে কোনোভাবেই তাদের আর তা করা হচ্ছে না। আর এই প্রাইভেট পড়াতে গিয়ে কোনো কোনো শিক্ষক কিছুটা অসততার আশ্রয়ও নিচ্ছেন। যারা নিচ্ছেন তাদের সংখ্যা খুব কম, কিন্তু দোষটা পড়ছে পুরো শিক্ষক সমাজের উপর। আবার যারা করছেন না, তারাও এই দোষে দুষ্ট হচ্ছেন। তার চেয়েও বড় কথা হলো, যে উদ্দেশ্যে পরীক্ষা নেয়া হয় পরীক্ষার সেই উদ্দেশ্য সফল হচ্ছে না। এই অবস্থা আর চলতে দেয়া যায় না। এক স্কুল কিংবা কলেজের প্রশ্নপত্র অন্য স্কুল কিংবা কলেজের শিক্ষকগণ করলে ছাত্র-ছাত্রীদের অরিজিনালিটি যাচাই করা যায় এবং ছেলে-মেয়েদের প্রাইভেট পড়তে বাধ্য করা হয় যে কারণে, সেটি আর তেমন গুরুত্ব পাবে না। কোনো স্কুলের এবং কলেজের প্রশ্নপত্র কোনো স্কুল কিংবা কলেজ করবেন তা উক্ত স্কুল ও কলেজের প্রধানগণ সিদ্ধান্ত নিবেন। ব্যাপারটি সমন্বয় করবেন শিক্ষা বিভাগের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ কিংবা স্কুল ও কলেজ প্রধানগণ নিজেরাই। উপরোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে কিছুটা গুণগত পরিবর্তন আনতে পারি, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকদের কোচিংয়ের উপর নির্ভরশীলতা কমাতে পারি।

www.pathagar.com

বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি বন্ধে সরকারি সিদ্ধান্ত

বিদ্যালয়ে শারীরিক শাস্তি না দেওয়ার জন্য সরকার একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে– এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। শিক্ষা একটি মানসিক ব্যাপার, শরীর সুস্থ তো মন সুস্থ। শরীরকে কষ্ট দিয়ে মানসিক কাজ করানো সম্ভব নয়, এটি যেমন অবৈজ্ঞানিক, তেমন অনৈতিক। আধুনিক শিক্ষাদানের কৌশলের সাথে এটি অসাঞ্জস্যপূর্ণ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শারীরিক শাস্তি প্রদান করেন কেন? নিম্নলিখিত কারণগুলোকে এজন্য দায়ী করা যায়।

(১) পুরাতন ধারণা যে, ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি প্রদান না করলে তারা বেয়াড়া হয়ে যাবে

(২) শাস্তি না দিলে এই বয়সের ছেলে-মেয়েরা সাধারণত পড়া তৈরি করে না।

(৩) শাস্তি না দিলে শিক্ষকদের ভয় করে না, আর ভয় না করলে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে তফাৎ থাকে না।

(৪) প্রাচীনকাল থেকেই আমাদের দেশে শিক্ষাদানের সাথে শারীরিক শাস্তির ব্যাপারটি চলে এসেছে। তাই ট্রাডিশন রক্ষার জন্য শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

(৫) শিক্ষাদানের আধুনিক পদ্ধতির সাথে অনেক শিক্ষকদের পরিচয় না থাকার কারণে তারা শাস্তির মাধ্যমে পড়া আদায়ের চেষ্টা করেন। আর একটি কারণ হচ্ছে, আমাদের দেশের পড়াশুনা হচ্ছে পরীক্ষানির্ভর, জ্ঞানার্জননির্ভর নয়।

(৬) অভিভাবকদের দাবির কারণে। অনেক অভিভাবক বলেন, 'আমার ছেলেক মানুষ করে দিবেন স্যার, আমি রক্ত-মাংস চাই না, শুধু হাড্ডি

www.pathagar.com

চাই।' শিক্ষকদের প্রতি তাদের অগাধ আস্থা যে, শিক্ষক তার ছেলে-মেয়েদের মানুষ করে দিবেন।

(৭) একজন শিক্ষককে পাঁচ/ ছয় এমনকি ৭টি পিরিয়ডও একদিন নিতে হয়। স্বভাবতই তার মন-মেজাজ ঠিক থাকার কথা নয়। অনেক বিরক্তি নিয়ে তাকে ক্লাসে পাঠদান করতে হয়। ঐ সময়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সামান্য উল্টোপাল্টা ব্যবহার বা উত্তেজিত কোনো কথা সহজেই একজন শিক্ষককে রাগান্বিত করে তোলে। ফলে শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন।

(৮) কিছু অনৈতিক কারণেও কিছু কিছু শিক্ষক ছাত্র-ছাত্রীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। তাদের কাছে প্রাইভেট না পড়ার জন্য। গার্ডিয়ানের সাথে সম্পর্ক ভালো না থাকলেও শাস্তি দিয়ে থাকেন। সেই রাগ শিক্ষার্থীর ওপর ঝাড়েন। অনেক শিক্ষক আছেন বিষয়ে দুর্বল, বেশি পড়াশুনাও করেন না, কিন্তু কিছু কিছু ছাত্র-ছাত্রী আছে যারা কৌতূহলী তারা শিক্ষকদের বারবার প্রশ্ন করে থাকে। তারা যাতে প্রশ্ন না করে, ভয়ে রাখার জন্য তাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন কিছু কিছু শিক্ষক।

(৯) অফিসিয়াল কোনো কারণে শিক্ষকগণ বিরক্ত থাকলে অর্থাৎ অধ্যক্ষ/ প্রধান শিক্ষক কোনো কারণে কোনো টিচারের সাথে খারাপ আচরণ করলে টিচারগণ সেই রাগ ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর বর্তান।

(১০) নিতান্ত ব্যক্তিগত কারণেও অনেক শিক্ষক শিক্ষার্থীদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। বাসায় কোন সমস্যা হলে সেই রাগ তারা শিক্ষার্থীর ওপর প্রয়োগ করেন।

রাজউক কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ কর্নেল নুরননবী সেনাবাহিনীর শিক্ষা কোরের অফিসার, মানুষ গড়ার কারিগর। তিনি দুইটি ক্যাডেট কলেজের (ঝিনাইদহ ও ফৌজদারহাট) অধ্যক্ষ ছিলেন, বর্তমানে মাইলস্টোন কলেজের অধ্যক্ষ। তিনি আমাদের বলতেন "ক্লাসে এমন হাক দিবেন যে ছাত্র-ছাত্রীরা ভয়ে থর থর করে কাঁপবে, বাঘের মতো ভয় পাবে। ক্লাসে কেউ মিন মিন করবেন না।" উক্ত অধ্যক্ষ ইউরোপের পাঁচটি দেশে শিক্ষা সফরে গিয়েছিলেন, এসে একই স্টাফ লাউঞ্জে আবার আমাদের বললেন, "ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্ক হবে বন্ধুর মতো, শুধুই বন্ধুর মতো। ইউরোপের দেশগুলোতে তাই হচ্ছে, আপনারাও তাই করবেন।"

www.pathagar.com

ক্যাডেট কলেজগুলোতে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশুনা করে, তারা পরিপাটি ও ডিসিপ্লিন্ড লাইফ লিড করে। পেছনে রয়েছে শাস্তি, বিভিন্ন ধরনের শাস্তি। তবে এখানে ম্যানহ্যান্ডেল অর্থাৎ হাত দিয়ে মারা নিষেধ। মিলিটারি কায়দায় বিভিন্ন ধরনের শাস্তি যেমন– একস্ট্রা ড্রিল, নেল ডাইন, ফ্র্যা জাম্প ইত্যাদি। পানিশমেন্ট দিচ্ছে রুমলিডার, হাউস লিডার, গেইমস প্রিফেক্ট, কালচারাল প্রিফেক্ট, কলেজ প্রিফেক্ট, ডিউটি অফিসার, অ্যাডজুটেন্ট, ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং দরকার হলে প্রিন্সিপালও।

কেন পানিশমেন্ট দিচ্ছে? তারা কি খারাপ ছাত্র-ছাত্রী? তারা কি পড়া তৈরি করে না? ক্লাসে আসছে না। না এর কোনোটিই নয়। ক্লাসে আসবে না এমন কোনো উপায় বা নিয়ম এখানে নেই, কারণ সব শিক্ষার্থীই আবাসিক। একমাত্র হাসপাতালে থাকলে ক্লাসে আসে না।

এখানে পানিশমেন্ট হচ্ছে একটি ট্রাডিশন। সিনিয়র ক্যাডেটরা পানিশমেন্ট দিচ্ছে, কারণ তারা পানিশমেন্ট খেয়ে আসছে, সেটা উসুল করতে হবে। প্রিফেক্টদের দায়িত্বই হচ্ছে পানিশমেন্ট দেওয়া, কারণে কিংবা অকারণে। পানিশমেন্ট না দিলে তারা তো প্রিফেক্ট নয়। কোনো কোনো সময় সিনিয়রার পানিশমেন্ট দিচ্ছে শুধু মজা করার জন্য। একদিন দেখলাম এক জুনিয়র ক্যাডেট (নবম শ্রেণির) সিঁড়ির সামনে 'নেলডাউন' করে আছে বন্ধের দিন। আমি ডিউটি অফিসার হিসেবে জিজ্ঞেস করলাম কি হয়েছে, কিছুই হয়নি। সিনিয়র ভাইয়ের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলো তাই। কিন্তু ছেলেটি কোরানের হাফেজ তাই ফ্যাকাল্টি মেম্বার অ্যাডজুটেন্ট, ভাইস-প্রিন্সিপ্যালসহ সবাই তাকে অন্য চোখে দেখে। আমি ছেলেটিকে উঠিয়ে দিয়ে সিনিয়র ক্যাডেটকে বললাম আমরাই ওকে সহজে কোনো শাস্তি দিই না, তোমরা দিলে কেন? কোনো কারণ নেই আর সে আসলে শাস্তি পাওয়ার মতো কোনো কাজও করে না।

আর একদিন ডিউটি অফিসার থাকাকালীন ক্যাডেটদের নিয়ে ডাইনিংয়ে বসেছি, ডিউটি ক্যাডেট একটি জুনিয়র ক্যাডেটকে নিয়ে এসে বলল, 'স্যার, সে অসুস্থ, ডিনার করতে পারবে না।' হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলাম। ডিনার শেষে একাডেমিক ব্লকে যাওয়ার পথে কলেজ হাসপাতালে ছেলেটিকে দেখতে গেলাম। হাসপাতাল থেকে প্রিফেক্টদের পরিবেষ্টিত হয়ে একাডেমিক ব্লকে আসার পথে জানতে পারলাম একাদশ শ্রেণির এক ক্যাডেট ডাইনিংয়ে আসার পথে তাকে শাস্তি দিয়েছে, তাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। উল্লেখ্য, কলেজের ৩০০ ক্যাডেট একসাথেই ১২টি ফাইলে

www.pathagar.com

ভাগ হয়ে একাডেমিক ব্লক থেকে মার্চ করতে করতে ডাইনিং হলের দিকে যায় প্রিফেক্টদের নেতৃত্বে। আমি ডিউটি অফিসার হিসেবে সব ফাইলের পিছনে ছিলাম, মাঝখানে বসেই শাস্তি দিতে দিতে ছেলেটিকে অসুস্থ করে ফেলেছে।

বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, "শাসন করা তারই সাজে সোহাগ করে যে।" বর্তমান কালের শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে আত্মার সম্পর্ক গড়তে পারেন না, কারণ তারা অর্থনৈতিকভাবে ও অনৈতিকভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর নির্ভরশীল, তারা প্রাইভেট পড়ানো নিয়ে ছাত্র-শিক্ষকরেদর সাথে পলিটিক্স করেন। ফলে তারা আর শাসন করার অধিকার রাখেন না। কিন্তু আগেকার দিনের শিক্ষকগণ যেমন ছিলেন নিবেদিত তেমন নিংস্বার্থ আর তাই তাদের দেওয়া শাস্তি অভিভাবক ও ছাত্র-ছাত্রীগণ সহজে মেনে নিতেন। আর এখন যেটি হচ্ছে নিজ স্বার্থের কারণে শিক্ষকগণ ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে খারাপ আচরণ করেন, মানসিক কষ্ট দেন, শারীরিক শাস্তি দেন। তাই সরকারের নেওয়া এই সিদ্ধান্ত বাস্তবসম্মত। আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে কি হয়েছে? যেসব ছাত্র-ছাত্রী নির্দিষ্ট কোনো শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়ে, ঐ বিষয়ের অন্য শিক্ষকের সামনে যাতে না পড়ে সেই জন্য তারা লুকিয়ে লুকিয়ে থাকে, ভয়ে ভয়ে থাকে। এ অবস্থার পরিবর্তন আনতেই হবে এই আধুনিক যুগে।

পশ্চিমা বিশ্বে শিক্ষার্থীদের ওপর শারীরিক শাস্তি প্রদানের কোনো বিধান নেই। তাই বলে তারা যে খুব ভালো আছে তাও বলা যাবে না। আমার কিছু সহকর্মী বললেন যে, তারা পরীক্ষা নিচ্ছে ক্লাসে, দেখা যাচ্ছে কিছু কিছু শিক্ষার্থী বাইরে ঘোরাফেরা করছে। শিক্ষকদের এবং অধ্যক্ষকে জিজ্ঞেস করলেন ওদের কি হবে। বললেন ওদের জন্য রাষ্ট্র পরীক্ষার আলাদা ব্যবস্থা করবে। যেহেতু তারা পরীক্ষা দিবে না, শিক্ষক বা স্কুল জোর করে তাদের পরীক্ষায় বসাতে পারবে না। এই তো অবস্থা। অত ছোট বয়সে সব সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না। অভিভাবক ও শিক্ষকদের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। উন্নত বিশ্বে শারীরিক শাস্তি নেই, ভালো কথা। শিক্ষার্থীদের সাথে শিক্ষকদের সম্পর্কও খুব একটা ভালো তাও বলা যাবে না। শিক্ষকদের সামনে ধূমপান করে, শিক্ষকদের সামনে অশালীন পোশাক পরে ক্লাসে আসে। আমার ভাই বিদেশি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। তিনি বলছেন যে, মেয়েরা অত্যন্ত অশালীন পোশাক পরে ক্লাসে আসে। চরম অবক্ষয়ের যুগেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের সামনে এখনও ধূমপান করে না। এখনও এই চরম অবক্ষয়ের যুগে আমার চোখ দিয়ে আনন্দে জল এসে যায়

www.pathagar.com

বাংলাদেশে শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক দেখে। আমার মনে আছে, রাজউক কলেজে চাকরি করার সময় আমার বাসা থেকে পাবলিক বাসে করে উত্তরায় যেতাম প্রতিদিন। প্রায়ই দেখতাম আমার অনেক ছাত্র-ছাত্রীও একই গাড়িতে কলেজে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এমন হতো যে, গাড়িতে বসার জায়গা নেই, দাঁড়িয়ে থাকতে হতো। হঠাৎ দেখতাম দুই একজন লোক দাঁড়িয়ে গেছে, কি হয়েছে। শব্দ আসতো স্যার এখানে বসুন। ভিড়ের মধ্যে দেখতাম রাজউকের ছাত্র, নিজে দাঁড়িয়ে যাবে তার শিক্ষককে বসার জায়গা করে দিয়ে। কোনোভাবেই বসতে চাইতাম না, দেখতাম ওরাও কোনোভাবেই বসবে না। পরে বাধ্য হয়ে বসতাম, গাড়ির অনেক লোক তাকিয়ে থাকত। সবচেয়ে বেয়াদব ছেলেটিও কখনও সামনে ধূমপান করতো না। একদিন দেখলাম রাস্তার পাশে আড়ালে বসে উত্তরার একটি দুষ্ট ছেলে সিগারেট খাচ্ছে। কোনো একসময় ক্লাসে তাকে বললাম তোমাকে সেদিন একটি খারাপ কাজ করতে দেখেছি। ছেলেটি বারবার জিজ্ঞেস করছে কি দেখেছেন স্যার। তার আড়ালে বসে ধূমপানের কথা বললাম, ছেলেটি বলল, 'সরি স্যার।' কোনো শিক্ষকের সামনে সে সিগারেট খায়নি। আড়ালে খেয়েছিল তারপরেও 'সরি' বলেছে।

ক্যাডেট কলেজ ছেড়ে এসেছি বহুদিন। হঠাৎ এক দুষ্ট ক্যাডেটের সাথে অনেক রাতে ফার্মগেটে ভিড়ের মধ্যে দেখা, সিগারেট ফুঁকছিল, দেখার সাথে সাথে সিগারেটের টুকরাটি পায়ের নিচে পিষে ফেলে মুখ থেকে ধোঁয়োটা হাত দিয়ে সরিয়ে সালাম দিলো, স্যার কেমন আছেন। ক্যাডেটরা অনেকটাই যান্ত্রিক, বাইরের শিক্ষার্থীদের মতো এত আন্তরিক থাকে না। তারপরেও শিক্ষকদের সাথে এই আচরণ, এটি কোনো আইন মানে না, আইন দিয়ে হয় না। আমিও চলে এসেছি ক্যাডেট কলেজে থেকে, সেও চলে এসেছে কিন্তু ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ঠিকই আছে। এই হলো আমাদের দেশের ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক।

আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি আশির দশকে তখন এক ম্যাগাজিনে একটি ছবি ও প্রতিবেদন ছাপা হয়েছিল। এক ট্রাফিক পুলিশ ঢাকার রাস্তায় ভিড়ের মধ্যে বৃদ্ধ এক লোকের পা জড়িয়ে ধরে অঝোরে কাঁদছে। অনেক লোক জমে গেছে চারদিকে, কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। ঐ ট্রাফিক পুলিশ চিৎকার করে কেঁদে কেঁদে বলছে, "ক্লাসে পড়া পারি নাই, স্যার ক্লাসে দাঁড়াতে বলেছিলেন, দাঁড়াইনি। আজ তাই দিনে আট ঘণ্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকি, এই আমার শাস্তি।"

www.pathagar.com

কাজেই শুধু আইন করে শিক্ষক ছাত্র সম্পর্ক বাড়ানো কমানো যায় না। উন্নত বিশ্বে কিছু অ্যাবনরমাল আইনও আছে যেমন, মা-বাবাও কোনো সন্তানের গায়ে হাত তুলতে পারবে না। তুললে তারা কোর্টে কেস করে দেয়, পুলিশ তাদের অ্যারেস্ট করে। এর চেয়ে অস্বাভাবিক আর কি আছে? মা-বাবা বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সম্পদ। সন্তানের জন্য তাদের চেয়ে রাষ্ট্র কিংবা বিচারব্যবস্থার মায়া বেশি থাকতে পারে না। ঐ সন্তানরা ওদের বাবা-মাদের খোঁজখবরও নেয় না, যখন তারা বৃদ্ধ হয়ে যান। আর আমাদের দেশের সন্তান নিজে এক বেলা খায় তারপরেও বাবা-মার সাথে থাকে, বাবা-মার সেবা করে। এ এক স্বর্গীয় অনুভূতি, স্বর্গীয় কাজ। পশ্চিমা বিশ্ব কোনো দিন এটা বুঝে না, হয়তোও বুঝবেও না। কাজেই আমরা সব ব্যাপারেই তাদের অনুসরণ করতে পারি না।

www.pathagar.com

শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে কিছু কথা

শিক্ষা মানুষকে দেয় আলো এবং সম্মুখে চলার পথ। শিক্ষা যখন আলো দানের পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে, তখন আমরা আসলে কাকে দায়ী করব? শিক্ষার্থীদের, না শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে, না অভিভাবকদের, না শিক্ষাব্যবস্থাকে, না রাজনৈতিক নেতৃত্বকে? আসলে কমবেশি সবাই দায়ী।

ক্রমবর্ধমান বেকারত্বের দেশ আমাদের বাংলাদেশ। পরিস্থিতি যে কত ভয়াবহ তা বিভিন্ন পরিসংখ্যান এবং চিত্রের মাধ্যমে বুঝা যায়। আমরা যখনই কোনো নিয়োগ পরীক্ষায় পরীক্ষা নিতে যাই, তখন দেখা যায় শিক্ষিত বেকারদের কি করুণ হাল। হাজার হাজার নয়, লাখ লাখ শিক্ষিত বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে চাকরি নামক সোনার হরিণের পিছনে। এই হরিণ ধরার জন্য দেখা যায় একশটি পদের বিপরীতে কয়েকশ কিংবা কয়েক হাজার প্রার্থী এসে হাজির হয়, সবাই উচ্চ শিক্ষিত। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এবং বছরের পর বছর তারা হয় বাবা-মায়ের উপর কিংবা টিউশনি বা এ ধরনের কিছু অস্থায়ী পেশার উপর নির্ভর করে চলছে। কোথায় তাদের ভবিষ্যৎ, কোথায় দেশকে কিছু দেয়ার চিন্তা আর কোথায় সুকুমার বৃত্তি কিংবা দেশ সেবার চিন্তা। শুধুই বেঁচে থাকার সংগ্রাম। এই চিন্তাই তাদের আচ্ছন্ন কর রাখে সর্বক্ষণ। তাদের চোখে-মুখে ফুটে উঠে যে দেশ, তার নাগরিকদের তেমন কিছু দিতে পারে না, সে দেশের নাগরিকগণও সে দেশকে তেমন কিছু দিতে চায় না বা পারে না।

ইন্টারভিউ নিতে গিয়ে দেখা যায়, অনেক প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষার সব নিয়ম-কানুন জানা থাকা সত্ত্বেও কঠিন বাস্তবতা এবং জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তাদেরকে মৌখিক পরীক্ষার বোর্ডেই কেঁদে ফেলতে বাধ্য করেছে। কেউ এসেছে বোনের ভর্তির টাকা দিয়ে সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় এসেছে পরীক্ষা দিতে, কেই পিতার চিকিৎসার টাকা যোগাতে পারছে না বরং সেই সংসারের উপরই নির্ভর করে তার

www.pathagar.com

শিক্ষিত জীবন চালাতে হচ্ছে, নেই বাবার জমি, যা দিয়ে উপার্জন বাড়াতে পারে কিংবা কিছু করে খেতে পারে।

এসব শিক্ষিত তরুণরা চাকরির পিছনে না ছুটে যদি নিজের গ্রামে ফিরে যায় এবং নিজেদের অল্প পুঁজি নিয়ে সমবায় সমিতি গঠন করে ছোটখাটো ব্যবসা, যেমন : মাছের চাষ করা, হাঁস-মুরগির ফার্ম করা, তরি-তরকারি ও উন্নত জাতের ফল চাষ, কৃষিকাজ, উন্নত জাতের ধান উৎপাদন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত হতে পারে।

একদিকে আমাদের শহরগুলো আর অধিক জনসংখ্যার ভার বইতে পারছে না। সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন বস্তি। আর বস্তিতে সৃষ্টি হচ্ছে মাদক আর অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়া। চরম স্বাস্থ্য হুমকির মতো পরিবেশ। কি দরকার শিক্ষিত তরুণদের ছোট মেসে থাকা, গুটিসুটি হয়ে এবং অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করা আর রাষ্ট্রের উপর চাপ বাড়ানো। তারা নিজেরাই কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারবে, উপকার করতে পারবে সাধারণ মানুষের, নিজেরা কারো মুখাপেক্ষী হবে না। নির্ভরশীল হবে না সরকার কিংবা দেশের প্রতি।

দেশের প্রতিটি ছোট ছোট জিলা শহরগুলোর কলেজে এখন অনার্স পড়ার সুযোগ রয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্স পড়ছে পাঁচ-ছয় কিংবা সাত বছর যাবৎ। তারপর মাস্টার্স করছে আরও এক-দুবছর ধরে। পুরো সময়টাই তারা কৃষক কিংবা স্বল্প আয়ের বাবা-মা-ও স্বল্প উপাজনের উপর নির্ভর করে পড়াশুনা করছে। বছরের পর বছর তারা মেসে থাকছে আর স্বপ্নের দিন গুনছে কবে নিজে উপার্জনক্ষম হবে, কবে বাবা-মা, ভাই-বোনদের উপকার করবে, কবে নিজে বিয়ে-সাদি করে সুখের সংসার গড়বে। কিন্তু পাস করার পর শুরু হয় আর এক বিড়ম্বনা। চাকরির জন্য ছুটতে হয়, দ্বারে দ্বারে আর অফিসে অফিসে। কিন্তু চাকরি মিলছে না। হতাশা নিত্যসঙ্গী।

কলেজে পড়ার সময়ই সমবায়ের মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন কর্মমূলক ও উৎপাদনমুখী কিছু একটা করতে পারে। তারা রাজনৈতিক নেতাদেও পেছনে না ছুটে এসব কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারলে দেশ-জাতি এবং নিজের পরিবার উপকৃত হবে। জীবনে সাফল্য আসবে।

www.pathagar.com

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য পৃথক বোর্ড গঠন সময়ের দাবি

যুগের চাহিদার সাথে তাল মিলাতে গিয়ে দেশের আনাচে-কানাচে গজিয়ে উঠেছে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের ব্যাপ্তি ঘটেছে রাজধানী শহর ঢাকা থেকে থানাশহর এমনকি গ্রাম পর্যন্ত। আর এ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাথে জড়িয়ে পড়ছে প্রকৃত বিদ্যানুরাগী থেকে শুরু করে ব্যবসায়ী এবং বেকার ছেলে-মেয়েরা পর্যন্ত। ফলে শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাহত। শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের নেই কোনো ব্যবস্থা। সিলেবাস প্রণয়নের মধ্যে লক্ষ করা যাচ্ছে সমন্বয়হীনতা। এ অবস্থায় ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা সময়ের দাবি।

লন্ডন ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আমাদের দেশে যেসব ইংরেজি মাধ্যম স্কুল 'ও' এবং 'এ' লেভেল প্রদান করে থাকে, এ ধরনের স্কুলগুলোকে সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে। দেশের কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলোকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরে নিবন্ধন করতে বলা হয়েছে। বিষয়টি নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবি রাখে। অন্তত এটুকু বলতে পারি যে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোর লাগামহীন গতির উপর সরকারের কিছুটা নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হবে এ নীতির ফলে। আবার ভয়ও হচ্ছে অনেক, কারণ সরকারি নিয়ন্ত্রণ মানে খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি, শিক্ষার মান টাকায় মাপা আর দুর্নীতির ছড়াছড়ি। আমরা সরকারি চিন্তাভাবনাকে সাধুবাদ জানাই। ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে সরকারি নিয়ন্ত্রণের পূর্বে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার ব্যবস্থা করতে হবে। পুরো ব্যাপার ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং সর্বোপরি দেশবাসীর নিকট স্পষ্ট হতে হবে। সরকারি নীতি-নির্ধারণীতে এবং পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব

www.pathagar.com

এবং লাগামহীন দুর্নীতি। এ অবস্থা যেন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোতে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে দেখা না দেয়।

আমাদের কেন এত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়? বিশ্বায়নের প্রভাবে দুনিয়াব্যাপী ইংরেজি ভাষার গুরুত্ব বেড়ে চলেছে। গোটা দুনিয়া এখন পরিচিত 'গ্লোবাল ভিলেজ' নামে। গোটা দুনিয়ার মানুষ এখন বাস করছে একই প্রতিবেশীর মতো। একে অপরের ক্ষেত্রে যোগাযোগের কমন ভাষা হচ্ছে ইংরেজি। ইংরেজি জানলে চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে পাওয়া যায় অগ্রাধিকার। এসব কারণে অধিকাংশ অভিভাবক ছুটছে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পেছনে। আর সেই সুবাদে কিছু ব্যবসায়ী ও বেকার লোকজন ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের পসরা সাজিয়ে বসেছে।

আরও একটি কারণে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে দেশি মাধ্যমে উপযুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা। অনেক অভিভাবক বাধ্য হয়েই তাদের বাচ্চাদের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পাঠান। মানসম্মত বাংলা মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা জনসংখ্যা অনুপাতে নিতান্তই কম, এ সংখ্যা বাড়াতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে সমাজের বিদ্যোৎসাহী, বিত্তবান লোকজন এবং সরকারকে।

ঢাকাসহ দেশের বড় বড় শহরগুলোতে কিছু প্রতিষ্ঠিত ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় আছে। এগুলোর পাঠ্যক্রম লন্ডন ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযের অধীনে পরিচালিত হয়ে থাকে। এ বিদ্যালয়গুলো শিক্ষার্থীদের অবশ্যই উঁচুমানের শিক্ষা প্রদান করে থাকে, কিন্তু এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়ানোর মতো সামর্থ্য অনেকেরই নেই। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যে সমাজে বিরাট ব্যবধান সৃষ্টি করে রেখেছে। মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষের জন্য ইংরেজি মাধ্যমে পড়ালেখার সুযোগ থাকতে হবে। সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হলে এ ব্যাপারটি অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখতে হবে তবে মান নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আপস করা যাবে না।

নামীদামি এই ইংলিশ মাধ্যম স্কুলগুলোতে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে এক ধরনের সাংস্কৃতিক শূন্যতা লক্ষ করা যায়। দেশীয় কৃষ্টি-কালচারে এখনকার শিক্ষার্থীরা অতটা আগ্রহী হয়ে উঠে না। দেশীয় কালচারের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য এদেরকে উৎসাহিতও করা হয় না। বাংলা ভাষা শেখার প্রতি তারা অনীহা প্রকাশ করে থাকে।

এমনকি অনেক ছেলে-মেয়েদের মাঝে অনেকটা উন্নাসিক মনোভাব পরিলক্ষিত হয়। তারা মনে করে, আমরা অচিরেই বিদেশে চলে যাব। অতএব বাংলা ভাষা জানা আমাদের জন্য জরুরি নয়। তারা ভুলে যায়, বিদেশে গিয়ে তাদের এদেশের

www.pathagar.com

প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। এটিই হচ্ছে দেশপ্রেমের ধারণা। তাদের মধ্যে এ ধারণা জন্ম দেয়ার তেমন উদ্যোগ লক্ষ করা যায় না ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোতে।

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উপস্থিতি সমাজে একধরনের বৈষম্য সৃষ্টি করছে। বেসরকারি বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয়গুলোর বেতন দু'শত থেকে সাতশত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ। অপরদিকে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের বেতন এক হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। নিঃসন্দেহে সমাজে এটি একটি বিরাট বৈষম্যের জন্ম দিচ্ছে। স্বভাবতই এখানকার ছেলে-মেয়েরা একটু নাক উঁচু ভাব নিয়ে বড় হতে দেখা যায়। এতকিছুর পরেও ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের উপস্থিতি এবং প্রতিষ্ঠা অস্বীকার করা যাবে না। কারণ এটি যুগের চাহিদা। ইংরেজি আমাদের শিখতে হবে এবং হচ্ছে। বাংলা মাধ্যম স্কুল কিংবা কলেজে যে পদ্ধতিতে ইংরেজি শেখানো হয় বাস্তব জীবনে তা প্রয়োগ করতে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে না অর্থাৎ তাদেরকে সেভাবে শেখানোর ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তাছাড়া আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারত এবং পাকিস্তানেও প্রচুর ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় আছে। অতএব আমরা এ মাধ্যমে লেখাপড়া করা বা করানো একেবারে অস্বীকার করতে পারব না। তবে আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করেও ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে ভালো বাংলা জানে এবং দেশীয় কৃষ্টি-কালচারকে শ্রদ্ধা করতে শিখে। এ কারণেই আমরা চাইব ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর উপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা হোক। তবে সেই নিয়ন্ত্রণ যেন কিছুসংখ্যক সরকারি কর্মকর্তার উৎকোচ গ্রহণের সুযোগ না হয় এবং শিক্ষার মান নিম্নগামী না যায়।

www.pathagar.com

শিক্ষকদের সচেতনতা এবং শিক্ষাদান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত

সমাজ, রাষ্ট্র, দর্শন এবং পারিপার্শ্বিকতার সাথে শিক্ষকদের পরিচিতি এবং শিক্ষাদান ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অনেকে মনে করেন, শিক্ষকদের এগুলো জানার এবং শিক্ষাদানের সাথে কি সম্পর্ক আছে? শুধু পাঠ্যবই পড়ানো নয়, পাঠ্যবইয়ের পাঠকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলার জন্য একজন শিক্ষকের বাহ্যিক জ্ঞান অবশ্যই থাকতে হবে।

ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি সুবিধাবঞ্চিত কমবেশি ৫০০ গ্রামীণ স্কুলে প্রতিবছর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ সহায়তা দিয়ে থাকে, কারণ তাদের প্রাইভেট পড়ার সুযোগ এবং সামর্থ্য নেই, শিক্ষকস্বল্পতা, পূর্ব থেকেই কঠিন বিষয়গুলোতে সঠিক পাঠদান না হওয়ার কারণে দেশের স্বাভাবিক এসএসসি পরীক্ষার্থীদের চেয়ে এসব স্কুলের পরীক্ষার্থীরা অনেক পিছিয়ে থকে। এ বছর থেকে নতুন জেএসসি অর্থাৎ জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। এবারও সুবিধাবঞ্চিত ৪৫০ স্কুলে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচি এই সুবিধা দিচ্ছে। এগুলোর প্রধান সমন্বয়ক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সাথে নতুন পরিচয়ের মাত্রা যোগ হয়েছে আর নতুন কিছু বিষয়ের গভীরে যাওয়ারও সুযোগ হয়েছে। বিশেষ সহায়তার মধ্যে সহজ ও উন্নত পদ্ধতিতে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে বিষয়গুলোর জন্য বই, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি দেয়া হয়ে থাকে। তারপরেও কোন কঠিন সমস্যায় পড়লে যাতে তারা ব্র্যাকের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সাথে যোগাযোগ করতে পারে সেজন্য কয়েকটি সেল নম্বর দেয়া আছে। সেল নম্বরগুলোতে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং অভিভাবকগণ ফোন করে থাকেন। কিছু শিক্ষকদের ফোনের আলাপ এখানে তুলে ধরছি।

"হ্যালো এইডা কি ব্র্যাক ব্যাংক?" আমি উত্তরে বলি না এটি ব্র্যাক ব্যংক নয়, আপনি কি জানতে চাচ্ছেন, আপনার পরিচয়টা দেন। উত্তর আসে, তাইলে এইডা

www.pathagar.com

কি? আমি প্রশ্ন করি আপনার কি দরকার সেটা বলেন। ঠিকভাবে বলতে পারেন না এবং পরিচয় দেন না, যেটি আসলে প্রথমেই দেয়া দরকার। যখন বারবার অনুরোধ করার পর তাদের পরিচয় দেন, তখন আমি নিজেই লজ্জা পাই।

প্রধান শিক্ষক ফোন করে বলেন এইডা কি ব্র্যাক অফিস। আমি উত্তরে বলি হ্যাঁ, ব্র্যাক প্রধান কার্যালয়। উত্তরে বলেন, প্রধান কার্যালয় কি রংপুর? আমি শুধু বললাম আমি সর্বদাই শিক্ষকদের পক্ষে। আমি নিজে সরাসরি শিক্ষক ছিলাম, এখনও শিক্ষকদের নিয়েই কাজ করি। তাদের যে কোনো ধরনের সমস্যা আমার সমস্যা মনে হয়, আমি শিক্ষকদের অনেক উঁচু স্থানে দেখতে চাই। একজন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক যদি না জানেন যে, কোনো সংস্থার প্রধান কার্যালয় একটা জেলা শহরে হতে পারে না, তাহলে তারা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক যারা দেশের কর্ণধার হবেন, তাদের কি শিক্ষা দিয়ে থাকেন? সিলেট থেকে এক শিক্ষক ফোন করে বলছেন, আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই আপনাদের হেড অফিসে আসতেছি, পুস্তক নেয়ার জন্য। আমি ভাবলাম উনি বোধ হয় বর্তমানে ঢাকায় আছেন, অতএব কিছুক্ষণের মধ্যে অফিসে আসবেন। আমি ফোনে জিজ্ঞেস করলাম আপনি কি ঢাকায়? উত্তরে উনি বললেন না, আমি সিলেটে। তাহলে আপনি কীভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে হেড অফিসে আসবেন? উনি বললেন আমি আপনাদের হেড অফিস চিনি। অর্থাৎ ব্র্যাকের সিলেট অফিস চিনেন এবং সেটাকেই উনি হেড অফিস ধরে নিয়েছেন। অর্থাৎ অনেক শিক্ষকদেরই এই অবস্থা।

এই প্রসঙ্গে আমার শিক্ষকতা জীবনের একটি কথা মনে পড়ে গেল। আমরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে সদ্য শিক্ষকতায় প্রবেশ করেছি। গিয়ে দেখলাম অনেক শিক্ষক নোট বানিয়ে ঐ নোট দিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়াচ্ছেন। সেখানে ইংরেজিতে একটি প্যারাগ্রাফ থাকত 'হাউ টু বি কাম এ নার্স।' সবাই লিখত আফটার এসএসসি পাস ওয়ান ক্যান টেইক টু ইয়ার্স নার্সিং ট্রেনিং অ্যাট ঢাকা মেডিকেল কলেজ। নার্সিং তখন প্রতিটি মেডিকেল কলেজেই চার বছরের ডিপ্লোমা হিসেবে পড়ানো হতো। দুই বছরের নার্সিং ট্রেনিং তখন নেই বললেই চলে। শিক্ষকদের বিষয়টি জানা নেই বলে ছাত্র-ছাত্রীদের ওই নোট করা গৎবাঁধা প্যারাগ্রাফই পড়াতেন, আসল জিনিস জানাতে পারতেন না। অথচ একজন শিক্ষককে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে এসব ব্যাপারে।

আর একজন গণিত শিক্ষকক্ষের পরিচিতি পুরো ক্যান্টনমেন্টে 'অংকের জাহাজ হিসেবে। কারণ উনি অনেক অংকের রেজাল্ট মুখস্থ বলতে পারতেন। এখানে কৃতিত্বের যে তেমন কিছু নেই তা কেউই ভেবে দেখছেন না। কারণ উনি নিজে

www.pathagar.com

বিএসসি পাস করার পর ২৫ বছর যাবত অংকই করাচ্ছেন, আর আমাদের পরীক্ষাপদ্ধতিতে ঐ বইয়ের বাইরে কোনো অংক আসে না। যে কেউ ২৫ বছর নয়, দু বছর অংক করালেই উত্তর বলে দিতে পারবেন। যেমনটি ঘটেছিল আমার ক্ষেত্রে। আমি উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলাম। এসএসসি পাস করার পর মনে আছে অনেক অংকের উত্তর মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। অনেক ছেলে-মেয়েরা আমার কাছে পড়তে আসত এবং ভাবত আমি অংকে নিশ্চয়ই জাহাজ বা এই জাতীয় কিছু হবো। যাই হোক জাহাজ পরীক্ষা করার জন্য আমার উক্ত সহকর্মীকে বিসিএস গাইড থেকে একটি অংক দিয়েছিলাম। দেখলাম বেচারা ঘেমে যাচ্ছেন। বহুবার বহুভাবে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত বললেন অংকটি আপনাকে আগামীকাল করে দেই। আসলে আমি তাকে পরীক্ষা করার জন্য যে উনি আসলে কতটা সৃজনশীল এবং কতটা অরজিনালিটি অংকে আছে তা দেখার জন্য, অংকটি আগামীকাল করার জন্য নয়। আমি তাকে শুধু ধন্যবাদ দিয়ে দিলাম। এই হলো আমাদের শিক্ষকদের সৃজনশীলতার নমুনা। বইয়ের বাইরে একটুও যাবেন না, যেতে চান না। পুরো সমাজে বাহবা কুড়ান আর শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল হওয়ার কোনো সুযোগ দেন না।

আমাদের দেশের কয়েক বছরের এসএসসি এবং এইচএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেখলে বুঝা যায় আমাদের শিক্ষকগণ কতটা সৃজনশীল। দশ বছরের প্রশ্নপত্র ঘাটলেও দেখা যায় অনন্য ব্যতিক্রম ছাড়া কোনো বছরই প্রশ্নপত্রের কোনো আইটেম শিক্ষকদের নিজেদের সৃষ্ট নয়। সব আইটেমই পূর্ববর্তী বছরের কিংবা বাজারের কোনো বই থেকে হুবহু নেয়া। একটি আইটেমও শিক্ষকগণ নিজের তৈরি করেন না। দেখলে অবাক হতে হয়। যদি কোনো শিক্ষক নিজ থেকে কোনো প্রশ্নপত্র তৈরি করেন তাহলে তাকে অযোগ্য শিক্ষক বলা হয়, কারণ মনে করা হয় তিনি প্রশ্ন কমন ফেলতে জানেন না। এখন দামি শিক্ষক হচ্ছেন কে কত সহজ সাজেশন তৈরি করতে পারেন, কে কত সহজে প্রশ্নপত্র কমন ফেলতে পারেন। সৃজনশীলতার কোনো স্থান নেই অথচ শিক্ষকতা ব্যাপারটি পুরোটই সৃজনশীল, পুরোটাই আনন্দের।

www.pathagar.com

শিক্ষকদের চিন্তা-চেতনা

১৯৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ক্যাডেট কলেজের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রাজউক উত্তরা মডেল কলেজে যোগদান করি। অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন ক্যাডেট কলেজের চাকরি ছেড়ে দিয়েছি কেন, কোনো সমস্যা হয়েছিল কি না ইত্যাদি। রেশন, সিএমএইচ-এ বিনামূল্যে চিকিৎসা, পেনশন, বিনামূল্যে ক্যাম্পাসে বাসস্থান ইত্যাদি সুবিধা ছেড়ে দিয়ে কেন ঢাকার যানজট, ধোঁয়া আর শব্দদূষণের মধ্যে চলে এলাম। আবার কেউ কেউ বলেছেন 'কাজের কাজ করেছেন, এবারে একেবারে ধনী হয়ে যাবেন, ব্যাচ পড়িয়ে কুলাতে পারবেন না।' আবার কেউ কেউ বলেছেন, 'ক্যাডেট কলেজে চাকরি করা মানে খাঁচার মধ্যে থাকা, নিজের কোনো স্বাধীনতা নেই। ভালো করেছেন।' আসলে পৃথিবীতে বিশেষ করে আমরা যারা চাকরি করি তাদের স্বাধীনতা কোথায় আছে?

মাঝে মাঝে যখন প্রাক্তন সহকর্মীদের সাথে দেখা হয়, তারা কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন করেন। যেমন– ব্যাচ কয়টি আছে? ফ্ল্যাট কয়টি কিনেছেন? জমি কোথায় কোথায় কিনলেন? মাসিক ইনকাম কয় লাখ ইত্যাদি। হ্যাঁ, আমি একজন সাধারণ মানুষ, আমারও অর্থের প্রয়োজন আছে, অর্থ উপার্জনের সৎ ও সুষম প্রচেষ্টা যে আমার নেই তা নয়। কিন্তু সব বিচার-বিবেচনার মাথা খেয়ে, দুনিয়ার খোঁজখবর বাদ দিয়ে, পড়াশুনার চর্চা বাদ দিয়ে দিনরাত প্রাইভেট ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা আমার ধাঁচে কুলায় না। রাজউকে চাকরি নিয়ে বাসা নিয়েছিলাম মনিপুরী পাড়া যাতে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা বেশি পড়তে না চায় আর বিশেষ করে আমার যে সব সহকর্মী একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন যে, ব্যাটা বোধ হয় আমাদের ইনকামে ভাগ বসাতে এসেছে, তারা যাতে বেশি বিরক্ত না হয়। কারণ কোনো কোনো সহকর্মী বলেছিলেন কেন যে ঢাকায় এলেন, ঢাকার পাশেই তো ছিলেন। তারা অবশ্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন, যাতে আমি তাড়াতাড়ি চাকরি

www.pathagar.com

ছেড়ে দেই। কিন্তু ছেড়ে দিব তো আমার সময়ে, তাদের কথায় বা কাজে তো নয়। সময়মতো ঠিকই ছেড়ে দিয়েছি, কিন্তু তাদের কথায় নয়।

ব্র্যাকের অফিসিয়াল কাজে যশোর গিয়েছিলাম চাকরি ছেড়ে আসার প্রায় আট বছর পর। কুষ্টিয়া হয়ে ঢাকায় আসার পথে ঝিনাইদহ ক্যাডেট কলেজে ঢুকলাম দুর্বলতা হেতু বা নস্টালজিয়ার কারণে। গেটে গিয়ে জানতে পারলাম আমার পূর্বেকার সহকর্মী ড. জয়নুদ্দীন ওখানকার ভাইস প্রিন্সিপাল। শুনে ভালো লাগল। তার কার্যালয়ে গেলাম, প্রথম কুশলাদি বিনিময়ের পরে প্রথমেই তিনি যে, প্রশ্নটি করেছিলেন তা হচ্ছে– বিল্লাহ সাহেবের লেখালেখি কেমন চলছে, ক্যাডেট কলেজের ওপর কিছু লেখা আমি পড়েছি, বই পুস্তক দু'চারটে বেরিয়েছে তো না হলে তাড়াতাড়ি করে বই বের করে ফেলুন। দীর্ঘদিন পরে উপযুক্ত শিক্ষকের মতো দুটো কথা শুনলাম। আমরা একই হাউসের হাউস টিউটর ছিলাম, একই সাথে কুমিল্লায় দীর্ঘদিন চাকরি করেছি, ওনার মিসেস আনিস হাসিনাও আমার সহকর্মী এবং একই সাথে বহু অনুষ্ঠান পরিচালনা করেছি আমি অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি আর আনিস হাসিনা ম্যাডাম লেডিস ক্লাবের সেক্রেটারি হিসেবে। দুজনই একই ধরনের প্রশ্ন করেছেন, একটিবারও জিজ্ঞেস করেনি ব্যাচ কয়টি, ইনকাম কেমন, ফ্ল্যাট কয়টি ইত্যাদি। খুবই ভালো লেগেছে, সারাজীবন মনে থাকবে এই শিক্ষকসুলভ প্রশ্ন, আলোচনা, পরামর্শ ও কথাবার্তা।

www.pathagar.com

সুবিধাবিহীন বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষার মান নিশ্চিত করবে কে?

দেশব্যাপী ৫১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এক জরিপ চালানো হয়। জরিপে দেখা যায়, অধিকাংশ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভগ্ন, কোলাহলপূর্ণ এবং আশপাশের অবস্থা ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। এই জরিপটি চালিয়েছে শিশুরা। জরিপে আরও দেখা যায় অধিকাংশ শিক্ষকগণই শিক্ষার্থীদেরকে শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দিয়ে থাকেন। অধিকাংশ ছাত্রীরাই বিদ্যালয়ে আসা-যাওয়ার পথে উত্ত্যক্তের শিকার হয়। ফলে তারা স্কুল ছেড়ে দেয় কিংবা বাল্যবিবাহ করে। সেভ দ্য চিলড্রেন, অস্ট্রেলিয়ার সহায়তায় 'চাইল্ড পার্লামেন্ট' একটি খসড়া প্রতিবেদন তৈরি করেছে। দেশের ৬৪টি জিলায় ১০২৪ জন ছাত্র-ছাত্রী ৫১২টি সরকারি, বেসরকারি প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসায় এই জরিপ চালানো হয়। এই স্যাম্পল রিসার্চ এবং রিপোর্ট মূলত আমাদের শিক্ষার বাস্তব অবস্থাটি তুলে ধরেছে। সেফ দ্য চিলড্রেনের কান্ট্রি ডিরেক্টর সুলতান মাহমুদ যথার্থই বলেছেন, 'করুণ ও ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠেছে এই সার্ভের মাধ্যমে।' আমরা এই ধারণা পাচ্ছি যে, শুধু স্কুল পরিচালনা বিষয়টিই যথেষ্ট নয়। শিশুদের উপযোগী করে গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। আমাদের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার অবস্থা খুব একটা ভালো থাকার কথা নয় এটি সত্য, কিন্তু এত খারাপ হবার কথা নয় যেটি এখানে ফুটে উঠেছে। অনেক সমস্যা আছে যেগুলো অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত নয় সেগুলোকে তো অন্তত আমরা এড়াতে পারি বা সেগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি। তাও কেন হচ্ছে না সেই প্রশ্নটিই এখন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

৮৬ শতাংশ বিদ্যালয় গৃহের দেয়াল ও ছাদ ভাঙা, ৮১ শতাংশ বিদ্যালয়ের কম্পাউন্ড পানিতে তলিয়ে যায় বৃষ্টি হলে, বর্ষায় ৮৯ শতাংশ বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ করে। জরিপকৃত দুই-তৃতীয়াংশ বিদ্যালয় কোলাহলপূর্ণ ও শব্দদূষণ হওয়ার

www.pathagar.com

মতো জায়গায় অবস্থিত। ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাসের পাঠে মনোযোগ দেয়ার মতো পরিবেশ বা অবস্থা নেই। ২৭ শতাংশ বিদ্যালয়ে প্রাচীর নেই, ২১ শতাংশের কোনো দরজা নেই। ৭ শতাংশ বিদ্যালয় সিনেমা হলের কাছে, প্রায় ২৭ শতাংশ বিদ্যালয়ের কাছে ভিডিওর দোকান। ৬৮ শতাংশ শিক্ষার্থীরা বলছে যে তারা শিক্ষকগণ কর্তৃক বিভিন্নভাবে শাস্তি পেয়ে থাকে। ৬২ শতাংশ ছাত্রী ভয়ে থাকে উত্ত্যক্তকারীদের এবং ৫৪ শতাংশ ছাত্রী সরাসরি উত্ত্যক্তের শিকার হয়। তিন-চতুর্থাংশ শিক্ষার্থীরা প্রাইভেট কোচিং পড়ে, ৪৬ শতাংশ শিক্ষকদের চাপে বাজারের গাইড বই কিনে, ৭৪ শতাংশ শিক্ষক ক্লাস নেয়ার সময় মোবাইল ব্যবহার করেন, ৫০% স্কুলে প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। এই পরিসংখ্যান আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার করুণ হাল পুনরায় চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

শিক্ষার এই করুণ হাল আসলে কি কাউকেই ভাবিয়ে তোলে না? চিন্তা করে দেখলাম যাদের ভাবিয়ে তোলে তাদের আসলে কি করার আছে। দায়ভার, নৈতিক দায়িত্ব এবং সচেতনতার জন্য হয়তো দু কলম লিখে সংশ্লিষ্টদের নাড়া একটু চেষ্টা করা, তাতে কতটা ফল হয় আর সব সময় তো জানানোও যায় না, কারণ পত্রিকাও তো সব সময় সবকিছু ছাপে না। জানতে পারলাম যে সব ছেলেরা স্কুলে যেত না বা গেলেও পাস কিংবা ডিগ্রি নেয়ার সুযোগ হয়নি তারাই এখন স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির সদস্য, সভাপতি, হর্তাকর্তা ইত্যাদি ইত্যাদি। রাজনীতির সুযোগে এলাকায় ভীষণ দাপটের সাথে চলছে, তাদের ছাড়া স্কুল চলে না, কলেজ, মাদ্রাসা মক্তব, মসজিদ চলে না, দেশের সালিশি চলে না, বাজার কমিটি গঠিত হয় না। হায়, গণতন্ত্র! গণতন্ত্রের সুবাদে এসব ছেলেরা এখন স্কুল কলেজের হর্তাকর্তা। তাদের ইচ্ছায় ভর্তি হয়, পরীক্ষা হয়, শিক্ষক নিয়োগ হয়, মিটিং হয়। বিদ্যালয়গুলোই বা কি পাবে আর দেশই বা কি পাবে তাদের কাছ থেকে? কে চিন্তা করবে এসব নিয়ে?

পূর্বে সরাসরি শিক্ষকতা এবং বর্তমানে ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচির কর্মকর্তা হিসেবে দেশের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী, ব্যবস্থাপনা কমিটির সাথে ঘন ঘন যোগাযোগ, বিদ্যালয় দেখা, বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক অবস্থা সরেজমিনে দেখা এবং ছাত্র শিক্ষকদের সরাসরি সংস্পর্শে আসার সুযোগ হচ্ছে আর জানতে পারছি দেশে শিক্ষার হাল হকিকত। হ্যাঁ, শিক্ষাক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে অনেক আবার পিছিয়েছেও অনেক। যেসব পরিবর্তন এসেছে তার তুলনায় যদি হিসেব করি যা চলে গেছে সেগুলোর হিসেব আমরা কীভাবে মেলাবো? যেমন ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক, ভক্তিশ্রদ্ধার সম্পর্ক, শিক্ষার মান এগুলো পূর্বের তুলনায় কোনোভাবেই মেলানো যাচ্ছে না, মেলাতে পারছি না। এগুলো কীভাবে আমরা

www.pathagar.com

উদ্ধার করব? অনেক স্কুলেই এখন ছাত্র-ছাত্রীরা কম্পিউটার শিখছে, কম্পিউটারে বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রামিং শিখছে কিন্তু দেশপ্রেম কি শিখছে? পারস্পরিক সহানুভূতি কি শিখছে? নীতি নৈতিকতা কি শিখছে? প্রচুর নম্বর পাচ্ছে অল্প পড়াশুনা করে। কিন্তু হারিয়েছে নিজের লেখার, বলার বা চিন্তা করার ক্ষমতা। এই ক্ষমতা আমরা কিসের বিনিময়ে ফিরে পাব? ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে মেধাবিকাশ নামে উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় নিয়োজিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের একটি বৃত্তি প্রদান করে থাকে। ২০০৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১১৮৭ জনকে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। যারা সরকারি মেডিকেল কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় গরিব অথচ মেধাবী (বাব-মা–দিনমজুর) তারা এই বৃত্তির আওতায় এককালীন ১০ হাজার টাকা এবং প্রতি মাসে ঢাকা শহর হলে তিন হাজার আর ঢাকার বাইরে হলে ২৫০০ টাকা পেয়ে থাকে। এসব ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে মাঝে কথা হয়, মিটিং হয়। জিজ্ঞেস করেছিলাম কে কে ইংরেজি পত্রিকা পড়ে, উত্তর এসেছিল একজনও না। আমি অবাক হলাম। আমরা যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছি, প্রত্যেকটি পত্রিকা (বাংলা এবং ইংরেজি) পড়তাম খুঁটে খুঁটে, তারপরেও রুমে ব্যক্তিগতভাবে একটি ইংরেজি পত্রিকা রাখতাম। ভেবেছিলাম এই যুগের ছেলে-মেয়েরা আমাদের চেয়ে আরও বেশি পত্র-পত্রিকা পড়ে, খোঁজখবর বেশি রাখে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে হতাশাব্যঞ্জক উত্তর পেলাম। বাংলা পত্রিকার নাম জিজ্ঞেস করেছিলাম, তাও দেখলাম দু-একটি বাংলা পত্রিকা ছাড়া তেমন কেউ ভালোভাবে বলতে পারে না অর্থাৎ বাংলা পত্রিকাও পড়ে না। তবে এদিক থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দু-একটি ছেলে-মেয়ে একটু এগিয়ে, তারা অন্তত দু-একটি পত্রিকার নাম বলতে পেরেছে যদিও নিয়মিত পত্রিকা পড়ে না। মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষিবিদ্যালয় এবং জেনারেল কলেজে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক পিছিয়ে। আমার এক সহকর্মীর সাথে আলাপ করে কারণ খোঁজার চেষ্টা করেছিলাম। তা থেকে যা বেড়িয়ে এসেছে তা হচ্ছে, এখন ছেলে-মেয়েরা মোবাইল ব্যবহার করে অনেক তথ্য জেনে নেয় এবং মোবাইলে কথা বলে প্রচুর সময় নষ্ট করে বলে পত্রিকা পড়তে আগ্রহী হয় না বা পড়ার সময় হয় না। কিন্তু মোবাইল থেকেই হোক আর টিভি থেকেই হোক পত্রিকার কলাম পড়ে যে জ্ঞান অর্জন এবং বিশ্লেষণের ক্ষমতা বাড়ে সেটি আমরা পাব কোথায়? ব্র্যাকের প্রশিক্ষণ নিতে আসা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জিজ্ঞেস করেও প্রায় একই ধরনের সাড়া ও উত্তর পেয়েছি। এ দ্বারাই বুঝা যায় শিক্ষার আসলে কতটা অগ্রগতি হয়েছে।

www.pathagar.com

অনেক শিক্ষকগণ বলে থাকেন যে, প্রাইভেটের কারণে দেশে ছাত্র-ছাত্রীদের পাসের হার বেড়েছে, শিক্ষার মান বেড়েছে ইত্যাদি। আসলে প্রাইভেটের কারণে বাড়েনি। পরীক্ষায় সহজে পাস করার জন্য এবং যেসব ছাত্র-ছাত্রী একটু ভালো তাদের আরও বেশি নম্বর পাইয়ে দেয়ার জন্য বাজারে বেরিয়েছে শত ধরনের গাইডবই, সহায়ক বই। সেই সাথে প্রাইভেট শিক্ষকদেরও ভূমিকা তো কিছুটা থাকবেই। কিন্তু একটি বিষয় লক্ষণীয় সেটি হচ্ছে, এই পাসের হার বেড়ে যাওয়া কিংবা জিপিএ-৫ পাওয়ার মান বেড়ে যাওয়া কি শিক্ষার মান বেড়ে যাওয়ার নির্দেশক? বিশ্ব অনেক দূর এগিয়েছে, সেখানে আমাদের উন্নয়নও তো কিছুটা হবেই। কিন্তু শিক্ষার মানের প্রশ্ন এলে আমরা অনেক পিছিয়ে আছি। গণিত ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখা যায় শিক্ষার্থীদের বেসিক জ্ঞান তেমন একটা উন্নত হয়নি। একটু ঘুরিয়ে দিলেও তারা আর উত্তর দিতে পারছে না। ইংরেজিতে জিপিএ-৫ পাওয়া একজন শিক্ষার্থীকে যদি তার পরিচিত পরিবেশ থেকেও একটা কিছু লিখতে দেওয়া হয়, দেখা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পারছে না। অথচ আমাদের শিক্ষক যাদের ফলাফল অতটা ভালো ছিল না কিন্তু বিষয়ের উপর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য এবং দক্ষতা। তার দুটি কারণ একটি হচ্ছে তাদের সময় নোটবই, গাইড বইয়ের প্রচলন না থাকায় নিজেরাই সবকিছু করতেন বলে সলিড জ্ঞান অর্জন করতেন এবং নিজেদের সৃজনশীল গুন প্রকাশ করার সুযোগ পেতেন। আর দ্বিতীয় কারণটি হচ্ছে তারা অত্যন্ত আন্তরিক ছিলেন বলে নিজ বিষয়ে প্রচুর পড়াশুনা করতেন। এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষকগণই পড়াশুনা করেন না, কারণ তাদের ইজমের কারণে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার গৌরব অর্জন করেছেন, পড়াশুনা বা রেজাল্টের জন্য নয়। আবার পদোন্নতি পাওয়ার জন্যও পড়াশুনা ও গবেষণার চেয়ে পার্টি পরিচয়টাই বড় করে দেখা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন এই অবস্থা তখন স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণ কেন পড়াশুনা করবেন?

এতকিছুর পরেও হাল ছেড়ে দেয়া যাবে না। ভালো ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষকতা পেশায় আকৃষ্ট করাতে হবে। আর তা করতে হলে তাদের জন্য ইনসেনটিভ থাকতে হবে, ভালো উপার্জনের সুযোগ থাকতে হবে। প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, খাতা পরীক্ষণ, পরীক্ষা গ্রহণ, বইপত্র লেখা, সভা-সমিতি, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামে অংশগ্রহণ ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই শিক্ষকদের বিচরণ থাকতে হবে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই অর্থ উপার্জনের ব্যবস্থা থাকতে হবে। দুর্বল ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন হলে স্কুল ও কলেজে বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে, সেখানেও অর্থের ব্যবস্থা থাকতে হবে। তাহলে শিক্ষকগণ আর্থিকভাবে লাভবান হবেন এবং তাদের পেশাগত উন্নয়নও ঘটবে। শুধু ক্লাস নেওয়া আর

www.pathagar.com

খাতা দেখা নিয়ে সৃজনশীল ও মেধাবী শিক্ষকগণ সন্তুষ্ট থাকতে পারবেন না। তাদের সৃজনশীল কাজে লাগাতে হবে।

শিক্ষকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ দরকার শুধু বিষয়ভিত্তিক নয়, মনস্তাত্ত্বিক, সামাজিক এবং নৈতিক বিষয়ের উপর। শিক্ষকগণ যেহেতু মানুষ গড়ার কারিগর, তাদেরকে অবশ্যই মানসম্মত প্রশিক্ষণ নিতে হবে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোতে, যাতে তারা সত্যিকার অর্থেই দেশের জন্য ভবিষ্যৎ সুনাগরিক গড়ে তুলতে পারেন। স্কুল গৃহকে এবং শ্রেণিকক্ষকে কীভাবে আকর্ষণীয় করা যায়, কীভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের শ্রেণিকক্ষে আকৃষ্ট করা যায়, কীভাবে তাদের নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা যায়, তার পুরো দায়িত্ব শিক্ষক সমাজকেই পালন করতে হবে শত বাধা এবং প্রতিকূলতার মাঝে আর এটিই হচ্ছে শিক্ষকতা এবং অন্যান্য পেশার মধ্যে পার্থক্য।

www.pathagar.com

ISBN 978-984-504-166-9

www.pathagar.com